অধিকারহারা জনগণের মুখপত্র

জাতীয় বার্তা

সত্য অন্বেষণে নিবেদিত

১ম বর্ষ । ৬ষ্ঠ সংখ্যা । ৫ জুলাই ২০১০ । পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮ । শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
email: jatyabarta.jumma@gmail.com

সপ্তাহের জবাব

প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান সমতল এলাকার লোকদের পাহাড়ে এনে সমস্যা জটিল করেছেন। অভিবাসন এখনো অব্যাহত রয়েছে। ... আমাদের অবস্থান হলো সকল অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে।

- সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, নিউ এজ এর সাথে সাক্ষাৎকার, ২৪ জুন।

- একদিকে সেটলার পুনর্বাসনের ফলে সমস্যা জটিল হয়েছে বলে স্বীকার করা, অন্যদিকে ভূমি বেদখল ও সেটলার পুনর্বাসন অব্যাহত রাখা; একদিকে অস্থায়ী ক্যাম্প প্রত্যাহার করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি, অন্যদিকে নতুন সেনা ক্যাম্প স্থাপন -- জনগণের সাথে এ কি তামাশা!

রুমায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের জন্য জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: দক্ষিণ পার্বত্য চট্টগ্রাম বান্দরবানের রুমা উপজেলায় রুমা বাজারের পাশে থানা পাড়া এলাকায় একটি বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

মোট ৪৫ একর জমি অধিগ্রহণ করে উক্ত ক্যাম্প স্থাপন করা হবে বলে জানা গেছে। গত ১৮ জুন এ লক্ষ্যে আমিন কানুনগো দিয়ে জমি পরিমাপ করা হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রুমা উপজেলা চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও রুমা জোনের কমান্ডার প্রমুখ। যে জমি অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তার মালিক ১ জন বাঙালি বাদে সবাই পাহাড়ি। সেখানে আম ও সেগুন গাছের বাগান রয়েছে। আর রয়েছে হেডম্যানের কার্যালয় ও তৈমু নামক এনজিওর শাখা অফিস।

উক্ত জমির পাশে ২য় পাতায় দেখুন

জুরাছড়িতে গ্রামবাসীর ওপর শারীরিক নির্যাতন, ইউপিডিএফ-এর নিন্দা

গত ১ জুলাই রাঙামাটির জুরাছড়িতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা তিন গ্রামবাসীর ওপর অকথ্য শারীরিক নির্যাতন চালিয়েছে। ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম জুরাছড়ি শাখার সভাপতি মহারঞ্জন চাকমা এক যুক্ত বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে তদন্ত সাপেক্ষে দোষীদের শাস্তি ও নির্যাতিতদের ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, গত ৩০ জুন গভীর রাতে রাঙামাটি ব্রিগেড থেকে এক মেজরের নেতৃত্বে একটি সেনা দল কাপ্তাই ব্রিগেডের অধীন সামিরা জুরাছড়ি গ্রাম ঘেরাও করে। এ সময় তাদের সাথে ২য় পাতায় দেখুন

সন্ত্র গ্রুপ কর্তৃক জেএসএস (লারমা) এর দুই সদস্য খুন

সন্ত্র গ্রুপের সশস্ত্র সদস্যরা পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির (লারমা) দুই সদস্যকে গুলি করে খুন করেছে। গত ২৬ জুন ভোর ৫টার দিকে লংগদু-দীঘিনালা সীমান্তে আদরকছড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন বারিজ্যা চাকমা (বয়স ৩৫, পিতার নাম লাঞ্চা চাকমা, গ্রাম সাধকছড়া, বোয়ালখালি ইউনিয়ন) ও সুনীল বিকাশ ত্রিপুরা (বয়স ২৮, পিতার নাম জয়ধন ত্রিপুরা, গ্রাম জামতলি, দিঘীনালা)।

সূত্রগুলো জানায়, কল্যাণ চাকমার নেতৃত্বে সন্ত্র গ্রুপের সদস্যরা ওঁত পেতে থাকে। সকালে ঘুম থেকে উঠে বের হলে সন্ত্রাসীরা গুলি করে তাদের দু'জনকে হত্যা করে। পরে এলাকার লোকজন প্রতিরোধ করলে সন্ত্র গ্রুপের সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

জনসংহতি সমিতি (লারমা) তাদের দুই সদস্যকে হত্যার তীব্র নিন্দা ও ঘটনার সাথে জড়িত সন্ত্র গ্রুপের সদস্যদের গ্রেফতারের দাবি জানান। সমিতির নেতৃবৃন্দ অধঃপতিত সন্ত্র লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণেরও দাবি জানান।

জেলা পরিষদের সরকারী বরাদ্দ কোথায় যায়?

অজয় লিপিরে: ১ জুলাই: জেলা পরিষদে গত জুনের শেষ সপ্তাহে দেখা গেল মানুষজনের ভিড়। খবর নিয়ে জানা গেল, জুন ফাইনাল চলছে তাই ৩০ জুনের মধ্যে সরকারী বরাদ্দ ভাগ করে নিতে হবে না হলে এগুলো সরকারী কোষাগারে ফেরৎ যাবে। এবার এখনো ২৫০০ মেট্রিক টন চাল গমের সরকারী বরাদ্দ যা উন্নয়নের কাজে প্রদান করা হয়েছে তা এখনো কোনো কাজে লাগানো হয়নি। এসকল বরাদ্দের ভাগ পেতেই লোকজন হুমড়ি খেয়ে জেলা পরিষদ প্রাঙ্গনে জড়ো হয়েছে। এ যেন চাকমা ভাষায় 'মাজ' বু' বা মহা সুযোগ এর মতো। তবে লোকজন বললে ভুল হবে, আসলে মূলতঃ যারা আওয়ামী লীগের তারাই জড়ো হয়েছে। এই বরাদ্দ জেলা পরিষদকে ৩০ জুনের মধ্যে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের প্রজেক্ট প্রস্তাবনা দেখিয়ে হাতিয়ে নিতে হবে। যারা আওয়ামী লীগের সাথে জড়িত এবং 'যাদের বড় বড় প্রভাবশালী' নেতার সাথে সম্পর্ক আছে তাদেরই নাকি ভাগের বরাদ্দ পাবার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশী। জানা গেল এ বরাদ্দ পেতে খরচ করতে হচ্ছে দরখাস্ত প্রতি এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রাপ্তির নিশ্চয়তার ভিত্তিতে টন প্রতি ছয় হাজার টাকা। তবু তারা এ টাকা খরচ করতে রাজি, কারণ এক টন বরাদ্দ পেলে তা থেকে ছয় হাজার বাদ দিয়ে আরো ১৫/২০ হাজার টাকা "লাভ" পাওয়া যাবে। এবং এ বরাদ্দ পেলে কোনো উন্নয়ন না করেই নিজের পকেটে রেখে দেয়া যাবে। প্রতি টন থেকে ঘুষ হিসেবে দেয় ছয় হাজার টাকা যাবে ক্যাডের মাধ্যমে মনোনীত অনির্বাচিত চেয়ারম্যান মেম্বারদের কাছে। এই বাণিজ্য থেকে তাদের আয় হবে দেড় কোটি টাকা। অনেকে বলে থাকে বর্তমান চেয়ারম্যান এবং মেম্বাররা মনোনয়ন পাবার জন্য পূর্ব থেকে কোটি টাকা তাদের পার্টির ফান্ডে জমা দিয়েছেন এবং তারই পুরস্কার স্বরূপ নাকি তারা এই চেয়ারে বসতে পেরেছেন।

জেলা পরিষদের মাধ্যমে প্রতি বছর শত শত কোটি টাকার তথাকথিত উন্নয়ন কর্মকান্ড হয়। আর এই উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে এভাবে পার্সেন্টিজের নাম করে ঘুষ হিসেবে হাতিয়ে নেয়া হচ্ছে কোটি কোটি টাকা। এই অর্থ লুটপাটের তদন্ত করার জন্য নেই কোনো অডিটের ব্যবস্থা। আর যেহেতু তারা নির্বাচিত নয়, তাই জনগণের কাছে তাদেরকে জবাবদিহিও করতে হয় না। লোকজন বলাবলি করে জেলা পরিষদ হচ্ছে দালাল-লুটপাটকারীদের "মিঠে ছুম" বা আখড়া। সরকারের অর্থ কিভাবে সুবিধাবাদী তৈরীতে ব্যবহার করা হয় এটি তার একটি জ্বাজ্বল্য উদাহরণ। জেলা পরিষদ দালাল তৈরির কারখানা বটে। চেয়ারম্যান-মেম্বারদের প্যানেলের মাধ্যমে নিয়োগ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে তারাই যোগ্য হিসেবে বিবেচিত হয় যারা বিনা টেন্ডারে সরকারের পক্ষ নিয়ে সবচেয়ে বেশী করে পাহাড়ি স্বার্থবিরোধী কাজে লিপ্ত হতে পারে। সচেতন ব্যক্তিদের অভিমত দালাল তৈরির এই "জুলা পরিষদ" (জনগের কাছে এটি এই নামেই সবচেয়ে বেশী পরিচিত) যতদিন থাকবে ততদিন দালালদের তৎপরতাও বাড় বাড়ন্ত হয়ে থাকবে। তাই আশু প্রয়োজন হচ্ছে এই দালাল তৈরির ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য জনগণের কার্যকর উদ্যোগ, অর্থাৎ আন্দোলন।

সিএইচটি কমিশনের সাথে ইউপিডিএফ-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত

পার্বত্য চট্টগ্রামে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (সিএইচটি কমিশন)-এর সাথে ইউপিডিএফ-এর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯ জুন বেলা ২ টায় খাগড়াছড়ি জেলা সদরের মহাজন পাড়াস্থ সূর্যশিখা ক্লাবে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে সিএইচটি কমিশনের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ক্রিস্টিয়ান, টম, স্বপন আদনান, মেঘনা গুহঠাকুরতা ও হানা শামস। অন্যদিকে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সদস্য ও খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক মিঠুন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রীনা দেওয়ান।

কমিশনের সাথে সাম্প্রতিককালে সংঘটিত সাজেক ও খাগড়াছড়ির ঘটনা, খাগড়াছড়িতে সভা-সমাবেশের উপর প্রশাসন কর্তৃক অঘোষিত নিষেধাজ্ঞা বহাল রাখা, পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি বেদখল ও ভূমি কমিশনের কার্যক্রম এবং ইউপিডিএফ নিষিদ্ধ করার যে ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চলছে সে বিষয়ে আলোচনা হয়। কমিশনের পক্ষ থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে বলে জানানো হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন ব্যতীত শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয় বলে ইউপিডিএফ-এর নেতৃবৃন্দ কমিশনকে জানান।

উল্লেখ্য যে, সিএইচটি কমিশনের সাথে যখন ইউপিডিএফ-এর নেতৃবৃন্দের বৈঠক চলছিলো তখন সূর্যশিখা ক্লাবের আশেপাশে পুলিশ ও গোয়েন্দা বাহিনীর কড়া বেষ্টনি ছিল, যা ইউপিডিএফ-এর নেতৃবৃন্দকে আতঙ্কগ্রস্ত করার অপচেষ্টা বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। বিজ্ঞপ্তি।

রাঙামাটিতে দুই ইউপিডিএফ সদস্য গ্রেফতার, অফিসে তল্লাশী

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: গত ২৬ জুন শনিবার ভোর ৪টার দিকে রাঙামাটি সদর উপজেলাধীন বালুখালি ইউনিয়নের মাস্টার পাড়া গ্রাম থেকে সেনাবাহিনী দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারকৃতরা হলেন প্যারী জয় চাকমা (২৮) পিতার নাম বিনি মোহন চাকমা গ্রাম দীঘলছড়ি, কুদুকছড়ি ও ইন্দ্রজিৎ চাকমা (৩৫) পিতার নাম নীল কমল চাকমা গ্রাম হেডম্যান গরিয়া, আইমাছড়া বরকল। তাদেরকে মঙ্গল চাকমার বাড়ি থেকে তুলে নেয়া হয়। তারা একই সাথে পারিবারিক ও সাংগঠনিক কাজে সেখানে অবস্থান করছিলেন।

অন্য এক ঘটনায় সুবলং ক্যাম্পের লেঃ হিমেল এর নেতৃত্বে একদল সেনা সদস্য একই দিন ভোর ৬:৩০টার দিকে ইউপিডিএফ-এর সুবলং অফিসে তালা ভেঙে ঢুকে তল্লাশী চালায়। তারা অফিসের কাগজপত্র তছনছ ও ইউপিডিএফ-এর দলীয় পতাকা ছিঁড়ে দেয়। এছাড়া সেনা সদস্যরা অফিসের পাশে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ২য় পাতায় দেখুন

খাগড়াছড়িতে মিছিল সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা: জেলা প্রশাসকের কাছে ইউপিডিএফ-এর চিঠি

গত ৩০ মে ইউপিডিএফ-এর পক্ষ থেকে খাগড়াছড়িতে সভা সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কিনা তা জানতে চেয়ে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসকের কাছে চিঠি দেয়া হয়েছে। তবে জেলা প্রশাসক এখনো এই চিঠির উত্তর দেননি বলে ইউপিডিএফ সূত্র জানিয়েছে।

জেলা প্রশাসকের কাছে লেখা উক্ত চিঠিতে বলা হয়: "বিভিন্ন সংবাদপত্রে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে যে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০১০ খাগড়াছড়িতে সংঘটিত সাম্প্রদায়িক হামলার পর অনুষ্ঠিত জেলার আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত নয় এমন রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

"সংবাদপত্রে প্রকাশিত উক্ত রিপোর্ট সত্য কিনা অর্থাৎ জেলা প্রশাসন কর্তৃক নির্বাচন কমিশনে অনিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশ ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে কিনা এবং যদি আরোপ করা হয়ে থাকে তাহলে দেশের প্রচলিত আইনের কোন ক্ষমতাবলে উক্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা ভুল বোঝাবুঝি এড়ানোর স্বার্থে লিখিতভাবে আমাদেরকে জানানো হোক এবং নিষেধাজ্ঞা আরোপের নোটিশ লিখিতভাবে আমাদেরকে দেয়া হোক।

"অন্যথায় আমাদের পার্টি ও সহযোগী সংগঠনসমূহ জেলা প্রশাসন কর্তৃক সভা-সমাবেশ ও মিছিলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে মর্মে প্রকাশিত সংবাদপত্রের রিপোর্ট সত্য নয় বলে ধরে নেবে।"

চিঠিটি লেখেন ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক কালোপ্রিয় চাকমা।

কাউখালিতে ঘর তুলতে সেটলারদের বাধা

রাঙামাটির কাউখালিস্থ কাঁচখালি গ্রামের নিজ জমিতে ঘর তুলতে গেলে স্থানীয় সেটলাররা এক পাহাড়িকে বাধা দিয়েছে। গত ২২ জুন মঙ্গলবার সকাল ন'টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, কাঁচখালি গ্রামের চিনু মং মারমা (পিতার নাম পিনথোয়াই মারমা), চাজাইপ্রু মারমা (পিতার নাম চাথোয়াই মারমা), উলাপ্রু মারমা (পিতার নাম থুইচাই মারমা) ও রুই চাই মারমা (পিতার নাম সোয়াইপ্রু মারমা) সকালে নিজ দখলীয় জমিতে ঘর তুলতে যায়। এ সময় হারেশ, তার ছেলে ইব্রাহীম, স্বপু ও তার ছেলে রফিক এর নেতৃত্বে ২০-২৫ জন স্থানীয় সেটলার তাদের বাধা দেয় ও শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে। সেটলাররা দীর্ঘদিন ধরে চিনু মং মারমার ৫ একর, চাজাইপ্রু মারমার ১ একর ও উলাপ্রু মারমার দেড় একর জমি বেদখলের চেষ্টা চালিয়ে আসছে। পাহাড়িরা বংশানুক্রমে উক্ত জমি ভোগ দখল করে আসছেন।

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত ঘটনার তীব্র নিন্দা এবং সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের জমি বেদখল রোধ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানান।

মানিকছড়িতে অবরোধ পালনকালে সেটলার হামলার প্রতিবাদে সমাবেশ অনুষ্ঠিত

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: রাঙামাটি জেলার মানিকছড়িতে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ডাকা সড়ক অবরোধ ও অবস্থান ধর্মঘট পালনকালে মানিকছড়িতে ফেডারেশনের নেতাকর্মিদের ওপর বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে ১৩ জুন কুদুকছড়িতে প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙামাটি জেলা শাখার উদ্যোগে আয়োজিত উক্ত সমাবেশে ১২ জুন শান্তিপূর্ণ অবরোধ চলাকালে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে অবরোধকারী ও সাংবাদিকদের ওপর তথাকথিত সমঅধিকার আন্দোলনের গুণ্ডাদের বেপরোয়া হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং হামলাকারীদের গ্রেফতারের দাবি জানানো হয়।

দুপুর আড়াইটায় উক্ত প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন হিল উইমেন্স ফেডারেশন রাঙামাটি জেলা শাখার সদস্য সচিব সাধনা চাকমা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন সংগঠনটির খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক মাদ্রী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রুচি মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সদস্য সচিব মাইকেল চাকমা।

নেতৃবৃন্দ বলেন, "একটি বিশেষ মহল গত চৌদ্দ বছর ধরে কল্পনা চাকমার অপহরণকারীদের রক্ষার জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই চেষ্টার অংশ হিসেবে এই মহলটির উস্কানিতে গতকালের হামলা চালানো হয়েছে।"

হামলায় আহত সাংবাদিকদের প্রতি সহমর্মিতা জানিয়ে বক্তারা অবিলম্বে হামলাকারীদেরকে বিচারের আওতায় নিয়ে আসা এবং কল্পনা চাকমাকে অপহরণের তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।

রামগড়ে আনসার প্রহরায় সেটলার কর্তৃক পাহাড়ি জায়গায় চারা রোপন

জাতীয় বার্তা: ২০ জুন: রামগড়ে আবারো সেটলার বাঙালিরা পাহাড়িদের জায়গায় আনসার প্রহরায় গাছের চারা রোপন করছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

সূত্র জানায় ২০ জুন সকাল থেকে রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের নাভাঙ্গা মৌজার পিলাভাঙ্গায় সেটলার বাঙালিরা আবারো পাহাড়িদের ১০ একর জায়গায় পাতাছড়া আনসার ক্যাম্পের একদল আনসারের প্রহরায় জোরপূর্বক গাছের চারা রোপন করছে। সকাল ১০টা পর্যন্ত তারা চারা রোপন করছিলো। এ সময় পর্যন্ত আনসাররা তাদের নিয়মিত পাহারা দিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়িরা বাঙালিদের প্রতিরোধ করতে চাইলে আনসাররা পাহাড়িদের তাড়িয়ে দেয় এবং বাঙালিদের গাছের চারা রোপন করতে উৎসাহ যোগায়।

উল্লেখ্য যে, এর কয়েকদিন আগেও সেটলার বাঙালিরা সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় পাহাড়িদের ১৫ একর জায়গা বেদখল করতে চেয়েছিলো। পাহাড়িদের ব্যাপক প্রতিরোধের ফলে উক্ত জায়গা বেদখল করতে ব্যর্থ হয়ে বাঙালিরা আবারো ঐ ১০ একর জায়গায় গাছের চারা রোপনের মাধ্যমে জোরপূর্বক বেদখল করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

উক্ত জায়গাটি দখলের লক্ষ্যে মূল ভূমিকা পালন করছেন কুমিল্লার বাসিন্দা আলাউদ্দিন নামে এক ব্যবসায়ী (কোম্পানী)। সে প্রায় সময় পিলাভাঙ্গায় এসে অবস্থান করে থাকে। আর তাকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিচ্ছে থলিবাড়ি এলাকার আওয়ামী লীগের ওয়ার্ড কমিটির সভাপতি বেলাল এবং সদস্য বাবুল। এরাই মূলত ভূমি বেদখলের কাজে বাঙালিদের উস্কে দিয়ে যাচ্ছে।

রামগড়ে ভূমি বেদখল প্রচেষ্টা সম্পর্কে প্রকাশিত ভুল তথ্যের প্রতিবাদে ইউপিডিএফ

গত ২১ জুন দৈনিক পূর্বকোণে "রামগড়ে ভূমি জবরদখল করে ঘর নির্মাণ: পাহাড়ি-বাঙালি উত্তেজনা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতিবাদ জানিয়েছেন ইউপিডিএফ-এর প্রচার বিভাগের নিরন চাকমা। ২২ জুন লেখা উক্ত প্রতিবাদ লিপিটি নিম্নরূপ:

আপনার বহুল প্রচারিত দৈনিকের ২১ জুন ২০১০ সংখ্যার ৫ম পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় কলামজুড়ে "রামগড়ে ভূমি জবরদখল করে ঘর নির্মাণ: পাহাড়ি-বাঙালি উত্তেজনা" শীর্ষক শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

উক্ত সংবাদে ইউপিডিএফ-কে জড়িয়ে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা সর্বৈব মিথ্যা। এ ধরনের ভুল ও বানোয়াট তথ্য ইউপিডিএফ সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে বিধায় আমরা তার প্রতিবাদ করছি।

রামগড় সংবাদদাতা কর্তৃক প্রেরিত উক্ত রিপোর্টের শুরুতে বলা হয়েছে: "গত শনিবার পার্বত্য শান্তি চুক্তি বিরোধী সংগঠন ইউপিডিএফের সশস্ত্র প্রহরায় রামগড়ের দুর্গম এলাকা পাইল্যা ভাঙ্গায় বাঙালিদের সরকারী বন্দোবস্তীকৃত ভূমি দখল করে একাধিক ঘর নির্মাণের অভিযোগ পাওয়া গেছে।" এই বানোয়াট ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত রিপোর্ট সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হলো: প্রথমত, ইউপিডিএফের সশস্ত্র প্রহরায় বাঙালিদের জমি দখল করে ঘর নির্মাণ করার কোন প্রশ্নই আসে না। ইউপিডিএফ কোন সশস্ত্র সংগঠন নয়। দ্বিতীয়ত, রামগড়ের দুর্গম এলাকায় বাঙালিদের বন্দোবস্তীকৃত জমি থাকতে পারে তা অবিশ্বাস্য। যদি সে ধরনের বন্দোবস্তীর কাগজপত্র থেকে থাকে, তাহলে তা হবে ভুয়া ও জাল। তৃতীয়ত, প্রশ্ন হলো শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের অভিযোগের ভিত্তিতে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রিপোর্ট করা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার দৃষ্টিকোণ থেকে কতটুকু সঠিক ও যুক্তিযুক্ত? ভূমি সমস্যা পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। ভূমিকে কেন্দ্র করে সাজেকে সৃষ্ট সহিংস ঘটনা প্রতিবেদকের অজানা থাকার কথা নয়। এ জন্য আমরা মনে করি, উক্ত প্রতিবেদন তৈরিতে প্রতিবেদকের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। তিনি ইচ্ছে করলে অভিযোগ প্রসঙ্গে ইউপিডিএফ-এর বক্তব্য জেনে নিতে পারতেন, প্রাপ্ত অভিযোগ সরেজমিন তদন্ত করে যাচাই করতে পারতেন। কিন্তু তিনি সে সব করেননি। ফলে তার রিপোর্টটি কেবল একপেশে নয়, ভুল ও অসত্য তথ্যে পরিপূর্ণ হয়েছে। মূল কথা হলো অভিযোগ যেহেতু ইউপিডিএফ-এর বিরুদ্ধে, সেহেতু রিপোর্টটি প্রকাশের আগে কোন ইউপিডিএফ নেতার বা প্রতিনিধির বক্তব্য নেয়া সমীচিন ছিল।

রিপোর্টে উল্লেখিত ঘটনা সম্পর্কে বিভ্রান্তি দূর করতে সঠিক তথ্য পরিবেশিত হওয়া দরকার। আর তা হলো এই: গত মে মাসের শেষ সপ্তাহ থেকে একটি শক্তিশালী সশস্ত্র সংগঠনের সহায়তায় কিছু সংখ্যক সেটলার রামগড় উপজেলাধীন পাতাছড়া ইউনিয়নের নভাঙ্গা মৌজায় তিন পাহাড়ি গ্রামবাসীর ১৫ একর জমি বেদখল করার চেষ্টা চালিয়ে আসছিল। গত ৭ জুন থলিবাড়ি এলাকার কাশেম ও বেলালের নেতৃত্বে এক দল সেটলার উক্ত জমি জোর পূর্বক দখলের জন্য ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে। পাহাড়িরা এতে বাধা দিলে সেটলাররা তাদের মারধর করে। এরপর ১৬ জুন সেটলাররা সশস্ত্র সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতিতে ওই জমিতে ঘর নির্মাণের চেষ্টা চালায় এবং চার পাহাড়ির ঘর ভেঙে দেয়। এতে স্থানীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং সড়ক অবরোধ করে প্রতিবাদের জন্য সংগঠিত হতে থাকে। এ অবস্থায় ইউপিডিএফ বিষয়টি সম্পর্কে খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসককে অবহিত করলে তিনি তড়িৎ ও সাহসী পদক্ষেপ নেন এবং উক্ত জমির বেদখল রোধ করেন।

আসলে বিগত সেনানিয়ন্ত্রিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সর্বত্র জমি বেদখল নতুন করে শুরু হয়। সে সময় পাহাড়িদের মালিকানাধীন শত শত একর জমি কেড়ে নেয়া নয়। বর্তমানেও কোন কোন এলাকায় জমি বেদখল প্রচেষ্টা বেশ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বেদখলকারী সেটলারদের পেছনে শক্তিশালী সশস্ত্র সংগঠনের মদদ থাকায় জমি বেদখল রোধ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জমি বেদখল রোধ করার জন্য সরকারের উচিত পাহাড়িদের বংশপরম্পরাগত প্রথাগত ভূমি মালিকানার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিয়ে আইন প্রণয়ন করা।

রাঙামাটিতে দুই ইউপিডিএফ

১ম পাতার পর

সদস্য দয়া চাকমা (৪৫) পীং তলমনি চাকমার বাড়িতেও তল্লাশী চালায়।

ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা এক বিবৃতিতে দুই ইউপিডিএফ সদস্যকে গ্রেফতার ও সুবলং-এ তল্লাশীর তীব্র প্রতিবাদ জানান । তিনি উক্ত ঘটনাকে গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকারের ওপর চরম হস্তক্ষেপ আখ্যায়িত করে অবিলম্বে গ্রেফতারকৃতদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি জানিয়েছেন।

রুমায় বিডিআর ক্যাম্প স্থাপনের

১ম পাতার পর

ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের একটি হোস্টেল রয়েছে। তবে হোস্টেলটি অধিগ্রহণ এলাকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

রুমা পুলিশের থানার পাশে অবস্থিত জমিটি রুমা বাজার থেকে সামান্য দূরে পূর্ব-দক্ষিণে সাংগু নদীর উজানে। এলাকাটি হেডম্যান চিং সা অং মারমার ৩৫৬ নং পলি মৌজার অধীন। এতে মোট ১৪টি হোল্ডিং-এর জমি রয়েছে, যার মালিক ২১ ব্যক্তি ও তৈমু নামে একটি স্থানীয় এনজিও। জমিগুলো প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর।

জানা গেছে, ক্যাম্পটি প্রথমে রুমা কলেজের পাশে স্থাপনের প্রক্রিয়া শুরু হয়। কিন্তু ইউএনও'র আপত্তির কারণে পরবর্তীতে থানা পাড়ার উক্ত জমি নির্বাচন করা হয়। তার আপত্তির কারণ হলো কলেজের পাশে বিডিআর ক্যাম্প স্থাপন করা হলে তা ভবিষ্যতে তা সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

অধিগ্রহণের ব্যাপারে জেএসএস সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করছে।

জুরাছড়িতে গ্রামবাসীর ওপর

১ম পাতার পর

গাইড হিসেবে ছিল জনসংহতি সমিতির সন্তু গ্রুপের সদস্য সিদ্ধার্থ, বারিজ্যা, হরণ ও নির্মল। তাদের প্রত্যেকের বিরুদ্ধে খুনসহ ৪-৫টি করে মামলা রয়েছে।

ভোর হলে সেনা সদস্যরা বন চন্দ্র চাকমা (৫৫), তার ছেলে পূর্ণ কুমার চাকমা ও প্রতিবেশী কর্ম ধন চাকমাকে (৪৫) জিজ্ঞেস করে ইউপিডিএফ এর সদস্যরা কোথায় থাকে। তারা জানে না বলে উত্তর দিলে সেনারা তাদের ওপর বেদম মারধর করে মুমূর্ষু অবস্থায় ফেলে রেখে যায়। বেপরোয়া নির্যাতনের সময় কর্মধন চাকমা চোখে সাংঘাতিক আঘাত পান। সুচিকিৎসা না হলে তার চোখ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

ইউপিডিএফ নেতা শান্তি দেব চাকমা ও ডিওয়াইএফ নেতা মহারঞ্জন চাকমা নিরীহ জনগণের ওপর এ ধরনের অত্যাচার বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, অতীতে সেনা সদস্যদের চরম অমানবিক অত্যাচার নির্যাতন ও জোর জুলুম সহ্য করা হলেও আর সহ্য করা হবে না।

প্রশাসনের বাধা সত্ত্বেও মহালছড়িতে পিসিপি'র ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মহালছড়ি প্রতিনিধি: গত ২০ মে ছিল পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এ উপলক্ষে মহালছড়ি উপজেলার কলেজ ও বিভিন্ন স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা জড়ো হয়েছিল থলিপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে। সেখানেই ছাত্র সমাবেশ হওয়ার কথা ছিল। সেভাবেই সেখানে সমাবেশের জন্য প্যান্ডেল তৈরি করা হয়েছিল। ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ-উদ্দীপনা ছিল। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কর্মীরা বিভিন্ন শ্লোগান দিয়ে কর্মিদের উদ্বুদ্ধ করছিলো। অনুষ্ঠান দুপুর ১২টায় শুরু হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাড়ে এগারটার দিকে মহালছড়ি উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো: শফিউল আরিফ একদল পুলিশসহ সমাবেশ স্থলে এসে হাজির হয়ে পিসিপি'র নেতৃবৃন্দকে খুঁজতে লাগলেন। নেতৃবৃন্দের মধ্যে যিনি প্রশাসনিক যোগাযোগের দায়িত্বে ছিলেন তিনি তার সাথে কথা বলতে গেলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাঁর হাতে থাকা একটি কাগজ দেখিয়ে বলেন, ডিসি মহোদয় আমাদেরকে অর্ডার দিয়েছেন সমাবেশ বন্ধ করে দিতে। এবং তিনি এও বলেন যে, আমরা সরকারী অনুগত কর্মচারী, নির্দেশ মানলেও সমস্যা হয় আর আপনাদের সভা করতে দিলেও জবাবদিহি করতে হয়। আপনাদের প্রতি অনুরোধ আপনারা সমাবেশ করবেন না। পিসিপি'র প্রতিনিধি ইউএনওকে বলেন, সভা সমাবেশ করার অধিকার সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত। আপনারা কোন যুক্তিতে সমাবেশ করতে দিচ্ছেন না। তাছাড়া আমরা শান্তিপূর্ণভাবে সমাবেশ করছি।

এ সময় মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা এসে সমাবেশের স্থান পরিবর্তনের জন্য পিসিপি নেতৃবৃন্দের প্রতি অনুরোধ জানান। নেতৃবৃন্দ চেয়ারম্যানের অনুরোধক্রমে মহালছড়ি সদর থেকে ২ কিলোমিটার দূরে সিঙ্গিনালা উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে সমাবেশের স্থান পরিবর্তন করেন। এ সময় পুলিশ ও ইউএনও সেখানেও সমাবেশ করতে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পিসিপি'র নেতবৃন্দ এবং সমবেত ছাত্র-ছাত্রীরা সমস্বরে সোচ্চার কণ্ঠে বলে ওঠেন 'আমরা সেখানে সমাবেশ করবো। আপনাদের কোন বাধাই আমাদের দমাতে পারবে না।' তারপর শান্তিপূর্ণভাবে সেখানে পিসিপি'র ২১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর ছাত্র সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। মহালছড়ি উপজেলার পিসিপি'র নেতৃবৃন্দ প্রশাসনের হুমকি-ধামকির মধ্যেও সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

বর্মাছড়িতে কল্পনা অপহরণ দিবসে সভা

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: বর্মাছড়ি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে কল্পনা চাকমা অপহরণ দিবস পালিত হয়েছে। প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে শত শত নারী পুরুষ ও ছাত্রছাত্রী এ উপলক্ষে সেখানে আয়োজিত সমাবেশে জড়ো হন।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ এর কেন্দ্রীয় সদস্য সচিব চাকমা ও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রতুল কান্তি চাকমাসহ আরো অনেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন ফটিকছড়ি ইউনিয়নের মহিলা সদস্য অনিতা রাণী চাকমা। এছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বর্মাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রাণ কুমার চাকমা। সভা পরিচালনা করেন ধর্ম মোহন চাকমা।

সচিব চাকমা বলেন, যারা কল্পনা চাকমাকে অপহরণ করেছে তারাই হলো পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের জন্য নিরাপত্তার সবচেয়ে বড় হুমকি। তিনি অবিলম্বে কল্পনা চাকমা অপহরণ তদন্ত রিপোর্ট জনসমক্ষে প্রকাশ করে লেঃ ফেরদৌসসহ দোষীদের শাস্তি দেয়ার দাবি জানান।

ফেব্রুয়ারীতে সাজেক ও খাগড়াছড়ি হামলা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের স্মারকলিপি

২৮জুন ২০১০
প্রতি,
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,
২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে পাহাড়িদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগসহ সহিংস হামলা চালানোর পর থেকে রাঙামাটি জেলার বাঘাইঘাট-গঙ্গারামমুখ এলাকায় বিরাজমান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির বিষয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (CHTC)১ গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। এই এলাকায় ২০১০ সালের ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি আবার সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। এই সহিংসতায় পাহাড়ি ও বাঙালিদের প্রায় ৫০০ বসতবাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয় এবং অন্তত দুজন পাহাড়ি নিহত হন। এই ঘটনার পর পর ২৩ ও ২৪ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি শহরে আরও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ঘটে।

এসব ঘটনাবলী পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও শাসনব্যবস্থার চরিত্র, অব্যাহত সামরিক নিয়ন্ত্রণ ও ফলস্বরূপ পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির সফল বাস্তবায়ন ও গণতন্ত্রায়নের প্রতিবন্ধকতাগুলোর বিষয়ে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন২ খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার আক্রান্ত এলাকাগুলোতে তদন্ত করার জন্য একটি দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়। ১৮ থেকে ২২জুন ২০১০ পর্যন্ত কমিশনের সদস্যরা সেখানে সরেজমিনে অনুসন্ধান চালায়।৩ এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ফেব্রুয়ারির গোলযোগের সময়ে আসলে কী ঘটেছিল তা নিরূপণ করা, এসবের পেছনে কী কী কারণ কাজ করেছে তা চিহ্নিত করা এবং এই সংঘাতের ফলে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা পোষানোর জন্য সুপারিশ প্রদান এবং ভবিষ্যতে যাতে এ রকম সহিংসতা না ঘটে তার জন্য প্রয়োজনীয় পন্থা প্রস্তাব করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন (CHTC) এর মিশন খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটি জেলার বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন করে এবং এই সহিংসতার সঙ্গে জড়িত এবং এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত সকল দল ও সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এবং তাদের মতামত জানতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালায়। এদের মধ্যে ছিলেন সহিংসতার শিকার পাহাড়ি ও বাঙালি জনসাধারণ, খাগড়াছড়ির সংসদ সদস্য, খাগড়াছড়ির ব্রিগেড কমান্ডার এবং বাঘাইহাটের জোন কমান্ডার, সরকারি কর্মকর্তা (রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলা প্রশাসক এবং বাঘাইছড়ির উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা), খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তাবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং খাগড়াছড়ি ও রাঙামাটির পাহাড়ি ও বাঙালি সম্প্রদায়ের রাজনীতিক ও নাগরিক সমাজের নেতারা (তাঁদের একটি তালিকা নীচে সংযুক্ত করা হয়েছে)।

বাঘাইহাটের ঘটনাবলী ও তার কারণ
বাঘাইহাট-গঙ্গারামমুখ এলাকায় আগুন লাগানো শুরু হয় ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে। এসব ঘটনায় ৪৩৪টি পাহাড়ি ও ২৯টি বাঙালি বসতবাড়ি পুড়ে যায় এবং সেই সঙ্গে দুজন পাহাড়ির মৃত্যু ঘটে। আগুন ধরিয়ে দেওয়ার কর্মকাণ্ডের সূত্রপাত সম্বন্ধে ওই এলাকার পাহাড়ি ও বাঙালি বাসিন্দা থেকে শুরু করে বেসামরিক ও সামরিক প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে কমিশনের সদস্যরা বিভিন্ন পরস্পরবিরোধী বর্ণনা শোনেন। সামরিক বাহিনী দাবি করে, সশস্ত্র 'উপজাতীয় দুষ্কৃতকারীদের' পেছনে নিয়ে একদল পাহাড়ি নারী বাঘাইহাটের একটি সেনা-চৌকির দিকে মিছিল করে এগিয়ে যায়। তাঁরা দাবি করেন যে, এ অবস্থায় তারা প্রথমে ওই নারীদের বিরুদ্ধে কী পদক্ষেপ নেবে সে সম্পর্কে দ্বিধায় ছিল। কিন্তু, সেনাবাহিনীর দাবি অনুযায়ী, দুষ্কৃতকারীরা যখন তাদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে একজন সৈনিককে মারাত্মকভাবে আহত করে তখন তারা আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়। সামরিক কমান্ডাররা আরও দাবি করেন যে, বাঘাইহাট-গঙ্গারামমুখ এলাকায় পাহাড়ি বসবাসকারীদের বসতবাড়িতে 'পাহাড়ি দুষ্কৃতকারীরাই' আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়। ২০ ফেব্রুয়ারি ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীরা ওই এলাকায় গুলিবর্ষণ ও পাহাড়িদের বাড়িঘরে আগুন লাগানোর খবরটি সমর্থন করেন। সেনাবাহিনী দাবি করে যে, ওই সব ঘটনাও 'পাহাড়ি দুষ্কৃতকারীরাই ঘটিয়েছে'। এমনকি কিছু বাঙালি বসতিস্থাপনকারী এবং বেসামরিক ও সামরিক কর্মকর্তারা এটাও দাবি করেন যে, 'পাহাড়িরা নিজেরাই তাদের বাড়িঘরে আগুন লাগিয়েছিল'। কিন্তু কেন পাহাড়িরা এ রকম আত্মঘাতী কাজ করে এভাবে নিজেদের ক্ষতি করবে তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে ব্যর্থ হন। তাদের যখন প্রশ্ন করা হয় যে, কীভাবে সেনা ও পুলিশবাহিনীর সদস্যসহ বেসামরিক কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে ২০ ফেব্রুয়ারি দিনের আলোয় এসব আগুন লাগানোর ঘটনা ঘটল, তখন জবাবে বেসামরিক কর্মকর্তারা বলেন যে 'উপজাতীয় দুষ্কৃতকারীরা' একটি সেতু পুড়িয়ে দেওয়ায় হামলাকারীরা যত দ্রুত আগুন লাগায় তত দ্রুত তারা পুলিশ মোতায়েন করতে পারেনি। অথচ, পুড়ে যাওয়া পাহাড়ি বসতিগুলোর অনেকগুলিই বাঘাইহাট সামরিক ঘাঁটি থেকে গাড়িতে মাত্র পাঁচ থেকে দশ মিনিটে পৌঁছুনো যায় এবং সেগুলোর অবস্থানও উক্ত সেতুর অনেক আগে।

সিএইচটিসি মিশন বাঘাইহাট-গঙ্গারামমুখ সড়কের যেসব স্থানে পাহাড়ি ঘরবাড়ি, একটি চিকিৎসাকেন্দ্র ও একটি বৌদ্ধ বিহার বা মন্দির পোড়ানো হয়েছে সেসব স্থান পরিদর্শন করে। যেহেতু এসব স্থাপনাগুলো একত্রিত নয় বরং ওই এলাকার নানা স্থানে ছড়িয়ে ছিল, তাই একটি নির্দিষ্ট জায়গায় আগুন লেগে তা ছড়িয়ে পড়েনি, বরং একটি পরিকল্পিত পদ্ধতিতে এক এক করে বাড়ীঘরগুলো পোড়ানো হয়েছে বলেই মনে হয়। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি সিএইচটিসি মিশনকে জানায় যে, কেরোসিন ও পেট্রোল ভর্তি বোতল হাতে অনেকজন বাঙালি তাদের ওপর আক্রমণ চালায় এবং ওই কেরোসিন ও পেট্রোল ব্যবহার করে তাদের ঘরবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনাগুলোতে আগুন লাগিয়ে দেয়। তারা অভিযোগ করে যে, এই বাঙালি হামলাকারীদের হাতে ছুরি ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ছিল এবং তাদের পেছন থেকে সহায়তা করেছিলো সেনাবাহিনীর সদস্যরা। কিছু পাহাড়ি মিশনকে জানায় যে, এক পর্যায়ে, তাদের বসতি পাহারা দেওয়ার কাজে নিয়োজিত পুলিশ তাদের পালিয়ে যেতে বলে, কেননা তাদের দিকে যে বাঙালি হামলাকারীরা ও সেনাসদস্যরা এগিয়ে আসছিলো তাদের আক্রমণ থেকে তারা (পুলিশেরা) তাদের রক্ষা করতে পারবে না।

২০১০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের এই আগুন লাগানোর ঘটনা নতুন কোন ব্যাপার নয়। বরঞ্চ, ধারাবাহিকভাবে চলতে থাকা এধরণের আক্রমণের সর্বশেষ নমুনা। কাসালং সংরক্ষিত বনে বহু আগে থেকেই অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পাহাড়ি পরিবারগুলো আশ্রয় নেয়। নিজেদের আদি ভূমি থেকে তাঁদের উৎখাত করা হয় ১৯৮০ ও ১৯৯০ এর দশকের বিদ্রোহ দমন অভিযানের সময়। সম্প্রতি সেনাবাহিনীর প্রকৌশলীদের তত্ত্বাবধানে বাঘাইঘাট থেকে সাজেক উপত্যকার গভীরে একটি পাকা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, এই সড়কের দুই পাশে যেসব পাহাড়ি বাস করে তাদের উচ্ছেদ করা হবে এবং তাদের জায়গায় বসানো হবে বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের। সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে যে দ্রুত গতিতে বাঙালিরা এই এলাকায় স্থানান্তরিত হয়েছিলো এবং পাহাড়িদের ভূমিতে বসতি স্থাপন করেছিলো তাতে এই উৎকণ্ঠা আরও তীব্র হয়েছে। সেই সময়টাতে সেনাবাহিনী ইচ্ছেমতো কাজ করতে পেরেছে। পাহাড়িদের ভূমি দখলের এই প্রক্রিয়ায় ক্রমশ উত্তেজনা বাড়তে থাকে। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৮ সালের ২০ এপ্রিল বড় আকারের অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটানো হয়। সেসময় পাহাড়িদের ৭০টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয় বাঙালিরা, যাতে সেনাবাহিনীর সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। ২০০৮ সালের আগস্টে সফররত পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কাছে পাহাড়িরা এ কথা বলেছিলেন। সেই সময় পাহাড়িরা কেমন ভয়ভীতির মধ্যে বসবাস করছিলেন সে বিষয়ে যারা কমিশনকে জানিয়েছিলেন তাদের অন্যতম লালুমনি চাকমাকে কমিশনের সফরের কিছুদিন পরেই খুন করা হয়।

সাম্প্রতিককালে পাহাড়িরা বাঘাইহাট বাজার বয়কট করছেন, অর্থাৎ সেখানে বেচাকেনা বন্ধ করেছেন। জোর করে বসানো বাঙালি বসতি স্থাপনকারীদের প্রত্যাহার করা, এবং অবৈধ চাঁদাবাজি এবং বাঙালি স্বার্থগোষ্ঠির চাপের কারণে বাজারের ভেতর দিয়ে যেতে গেলে পাহাড়িদের মালামাল নামাতে বাধ্য করার প্রতিবাদে তারা এই বয়কট চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে, স্থানীয় সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসন বাজারে অংশগ্রহণের জন্য পাহাড়িদের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করছে। এমন সব কায়দায় তাদের ওপর চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে যা তাদের বেঁচে থাকার পথগুলোকে বন্ধ করে দিতে পারে। যদিও একটি গণতান্ত্রিক সমাজে কোন নাগরিকদের ওপর এভাবে 'মুক্তবাজারে' অংশ নিতে বাধ্য করা উচিৎ নয়। বাজারে অংশগ্রহণ বিষয়ে এই দ্বন্দ্ব বাঘাইহাট এলাকায় আরও সাম্প্রদায়িক সহিংসতা উস্কে দিতে পারে- বিশেষ করে যেসব সমস্যার কারণে পাহাড়িরা বাজার বয়কট করতে বাধ্য হচ্ছেন তা যদি বন্ধ করার ব্যাপারে প্রশাসন আরও যুক্তিসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়।

খাগড়াছড়ির ঘটনাবলী ও তার কারণ
বাঘাইহাটের সহিংসতার প্রতিক্রিয়ায় পাহাড়ি তরুণেরা ২০১০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি খাগড়াছড়ি শহরে বিক্ষোভ মিছিল করে। তারা দোকানপাট ও সম্পত্তির কিছু ক্ষতিসাধন করে বলে জানা যায়। এর প্রতিক্রিয়ায় বাঙালি দোকানী ও জনতা তাদের ধাওয়া করে আক্রমণ চালায়। স্থানীয় এই সংঘর্ষ দ্রুত তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং নিয়ন্ত্রণহীনভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ফল হিসেবে খাগড়াছড়ি শহরে বাঙালি ও পাহাড়ি উভয়ের বসতবাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে; সেই সাথে নিহত হন একজন বাঙালি।

সত্যিকারে কেমন করে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটেছিল, সে ব্যাপারে কমিশন পরস্পরবিরোধী অভিযোগ পায়। লক্ষণীয় যে খাগড়াছড়ি শহরের সদর এলাকাতেই বিপুল সংখ্যক পাহাড়ি বসতবাড়ি আগুনে পোড়ানো হয়।

সিএইচটিসি মিশনের কাছে স্থানীয় সাংবাদিক ও গণমাধ্যমকর্মীসহ বিভিন্ন জনের দেওয়া সাক্ষ্য থেকে দেখা যায় যে, পুলিশের উপস্থিতিতেই হামলাকারীরা পাহাড়িদের বসতবাড়িতে আগুন দিয়েছে, কিন্তু তা প্রতিরোধে পুলিশ কোন ব্যবস্থা নেয়নি। কয়েকজন সাংবাদিকও বাঙালি অগ্নিসংযোগকারীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল; তাদের ক্যামেরা ও সরঞ্জামের ক্ষতিসাধন করা হয়েছিল। সাতভাইপাড়াতে ৪১টি বাড়ি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এগুলোর বেশিরভাগ ছিল মারমাদের। কিন্তু নিকটস্থ আমর্ড পুলিশ ব্যাটালিয়ন এবং অন্য একটি নিরাপত্তা চৌকির সদস্যরা এই সহিংসতা প্রতিরোধের কোন চেষ্টা করেনি। জেলা প্রশাসন ও সামরিক কমান্ড কয়েকটা গুরুত্বপূর্ণ ঘণ্টা ধরে এই সংঘাত বন্ধ করার জন্য কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়, যদিও সহিংসতা ঘটেছে তাদের নাগালের ভেতরই। এমনকি খাগড়াছড়ি শহরে ১৪৪ ধারা জারি করার পরও সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগ অব্যাহত থাকে, যা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমূহ ব্যর্থতাকেই প্রতিফলিত করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের মিশন খাগড়াছড়ির শান্তিনিকেতন এলাকাও পরিদর্শন করে। সেখানকার বাঙালি অধিবাসীরা জানায়, ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে কিছু পাহাড়ি তাদের ওপর হামলা করে এবং তাদের বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। মোহাম্মদপুরের আনোয়ার হোসেন নামক এক বাঙালি সংঘর্ষের সময় নিহত হন এবং আর একজনের খোঁজ এখনও মেলেনি। আমরা তার মৃত্যু সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী প্রতিবেদন পেয়েছি। আনোয়ারের এক মহিলা আত্মীয়ের ভাষ্যমতে, এক বাঙালি বাড়িতে পাহাড়িরা যে আগুন লাগায় তা নেভাতে গিয়েছিল আনোয়ার। এর পরবর্তী সংঘর্ষে সে নিহত হয়। তবে, পাহাড়িরা দাবি করেছেন, আনোয়ার একদল বাঙালির সাথে তাদের বাড়িঘরে আগুন দিতে গিয়েছিল। পাহাড়িরা তখন নিজেদের বাড়ি রক্ষা করতে গেলে যে সংঘাত ঘটে তাতে আনোয়ারের মৃত্যু হয়।

বেশ কিছু বাঙালি ও পাহাড়ি সূত্র থেকে জানা যায় যে, এই অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে তাদের ভূমি ও বসতভিটা ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য ভীতি প্রদর্শন ও বাধ্য করা। এক্ষেত্রে বাঙালিদের তুলনায় পাহাড়িদের অবস্থান অনেক দুর্বল এবং সে কারণে ভূমিগ্রাসের শিকার হওয়ার ঝুঁকিও তাদের জন্য অনেক বেশী।

ভূমি কমিশনের কর্মকাণ্ডের সমস্যাজনক দিক
অধিকাংশ পর্যবেক্ষক একমত যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল সংঘর্ষের প্রধান কারণ ভূমি বিরোধ। বর্তমান সরকার ভূমি কমিশন সক্রিয় করার চেষ্টা করেছে এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে এর চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। তবে ভূমি কমিশনের কার্যক্রম নির্ধারণ করার জন্য ২০০১ সালের যে আইন রয়েছে তা সম্বন্ধে পাহাড়ি সমাজের গুরুত্বপূর্ণ নেতারা প্রতিবাদ জানানো সত্ত্বেও এর নানা ত্রুটি সংশোধনের জন্য সরকার এখনো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়নি। পাশাপাশি ভূমি কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান এখনও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান এবং তিনজন সার্কেল চিফসহ ভূমি কমিশনের পাহাড়ি সদস্যদের সহযোগিতা পাওয়ার ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ দেখাননি। অধিকন্তু ভূমি বিরোধের নিষ্পত্তি না করেই ভূমি কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামে একটি কেডাস্ট্রাল সার্ভে বা ভূমি জরিপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও ভূমি জরিপ নয়, বরং ভূমি বিরোধের নিষ্পত্তি করাই কমিশনের ওপর অর্পিত প্রধান দায়িত্ব। উপরন্তু, ভূমি কমিশনের পাহাড়ি সদস্যদের সমর্থন না নিয়েই ভূমি দখলের বিষয়ে সবার কাছ থেকে অভিযোগ দাখিলের ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে মূলত বাঙালি বসতি স্থাপনকারী, যারা পাহাড়ি ভূমি দখল করে আছে, তারাই ভূমির দাবি পেশ করেছে। অন্যদিকে, পাহাড়িরা এবং তাদের প্রধান সামাজিক ও রাজনীতিক সংগঠনগুলো ভূমি কমিশনের এই বিতর্কিত কার্যপ্রণালী বয়কট বা বর্জন করেছে, যার ফলে তাদের অভিযোগপত্র জমা পড়েনি। এর ভেতরেই কমিশনের কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট পাহাড়িদের নোটিশ প্রদান করা হয়েছে। না গেলে তাদের অনুপস্থিতিতেই ভূমি বিরোধ মামলার নিষ্পত্তি হবে। এই 'আইনি কৌশলের' মাধ্যমে পাহাড়িদের ভূমি অধিকার হারানোর প্রচণ্ড আশংকা দেখা দিয়েছে। অথচ, পার্বত্যচুক্তিতে ভূমি কমিশনের যে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে এই সম্ভাব্য পরিণতি তার একদম উল্টো।

সুপারিশমালা
মিশনের প্রাপ্ত উপরোক্ত তথ্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন সরকার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের কাছে অবিলম্বে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো নেওয়ার জন্য সুপারিশ করছে:

১. বাঘাইছড়ি ও খাগড়াছড়ি শহরে ২০১০ সালের ফেব্রুয়ারিতে সহিংস হামলা ও হত্যাকাণ্ডের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্তে একটি উচ্চ পর্যায়ের স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে; নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যদের ৭ম পাতায় দেখুন

সম্পাদকীয়

সাজেক ও খাগড়াছড়ি হামলা: রাষ্ট্রের এথনিক কিনজিং পলিসির অনিবার্য পরিণতি

- রাহুল চাকমা

গত ১৯ - ২০ রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নে ১১টি পাহাড়ি গ্রামে সেনাবাহিনী ও সেটলারদের মিলিত হামলায় সাড়ে চার শতাধিক বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সেনাবাহিনীর গুলিতে সর্বশেষ হিসাব মতে কমপক্ষে তিন জন প্রাণ হারিয়েছেন। গুরুতর আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের রাজনৈতিক দল ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ ২৩ ফেব্রুয়ারী খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি জেলায় সড়ক ও নৌপথ অবরোধের ডাক দেয়। ঐদিন অবরোধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলেও স্থানীয় সেনা ও বেসামরিক প্রশাসনের মদদ-পুষ্ট সেটলাররা খাগড়াছড়ি শহরে ইউপিডিএফ-এর শান্তিপূর্ণ একটি মিছিলে হামলা করে ও পরে মহাজনপাড়া, নারিকেল বাগান, সাতভেইয়াপাড়া, হাই স্কুল এলাকা ও মিলনপুরসহ পাহাড়ি-অধ্যুষিত এলাকায় ঘরবাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় ও তাদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ব্যাপক লুটপাট ও ভাঙচুর করে। এই সব হামলার সময় পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব দর্শকের মতো। এমনকি ১৪৪ ধারা ও পরে সান্ধ্য আইন জারির পরও ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে সেটলাররা সাতভেইয়া পাড়ায় হামলা চালিয়ে মারমাদের অর্ধশতাধিক ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয়।

প্রায় পুরো জেলা প্রশাসন, সেনাবাহিনী ও তথাকথিত জাতীয় রাজনৈতিক দলের লোকজনকে সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততা গ্রাস করে। হামলার পরদিন ভোরে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ দল হামলাকারীদের গ্রেফতার না করে খবংপুজ্যা থেকে অর্ধ শতাধিক নিরীহ পাহাড়িকে আটক করে ও অনেকের ওপর অমানুষিক শারীরিক নির্যাতন চালায়। খবংপুজ্যা এলাকাটি তুলনামূলকভাবে বড় হওয়ায় ও ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে এখানকার জনগণ সুসংগঠিত বলে সেটলাররা এখানে হামলা চালাতে ব্যর্থ হয়। এ কারণে সেনাবাহিনী ও পুলিশের দল খবংপুজ্যা থেকে সামর্থ্যবান যুবক যাকে পেয়েছে তাকেই নির্বিচারে আটক করে।

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে সাম্প্রদায়িক হামলার বিরুদ্ধে দেশে বিদেশে ব্যাপক নিন্দা ও প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন ও ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংগঠনসমূহ প্রায় প্রতিদিন একের পর এক বিক্ষোভ সংঘটিত করতে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও শ্রীলংকায় প্রবাসী পাহাড়িরা বিক্ষোভে অংশ নেয়। যুক্তরাজ্যসহ কোন কোন দেশে প্রবাসী বাঙালিরাও এই সব প্রতিবাদে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এত প্রতিবাদ ও নিন্দা সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন দিন-বদলের সরকার ঘটনা তদন্তের জন্য আজ পর্যন্ত কোন কমিটি গঠন ও হামলাকারীদের গ্রেফতার করেনি।

কেন এই হামলা?

বর্তমান আওয়ামী সরকার মতায় আসার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়িদের ওপর এটাই সবচেয়ে বড় হামলা। তবে সাজেকে ভূমি বেদখলকে কেন্দ্র করে বিরোধ চলে আসছে ২০০৮ সালের প্রথমার্ধ থেকে। তখন দেশে সেনাবাহিনী-সমর্থিত ফখরুদ্দীন আহমেদ-এর তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতায়। দেশে জরুরী অবস্থার সুযোগ নিয়ে সেনাবাহিনীর সদস্যরা সে সময় বেশ কিছু সেটলার পরিবারকে সাজেকে নিয়ে আসে ও পাহাড়িদের জমি বেদখলের জন্য তাদের উৎসাহিত করে। সেই বছর ২০ এপ্রিল সেটলাররা বাঘাইহাট জোনের সেনা সদস্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তায় সাজেকের ৮টি গ্রামের ৩ শতাধিক বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। এর কয়েক মাস পর তারা আবারও পাহাড়িদের গ্রামে হামলা চালায় ও লাদুমনি চাকমা নামে এক পাহাড়িকে নৃশংসভাবে খুন করে।

সাজেকবাসী দীর্ঘ দিন ধরে ভূমি বেদখল, সেনা নির্যাতন, বাড়িঘরে তল্লাশী ও চেকপোস্টে হয়রানি বন্ধ ও সেটলারদের সরিয়ে নেয়ার দাবি করে আসছিলেন। এ বছর জানুয়ারী মাসের প্রথম দিকে তারা বাঘাইছড়ি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কাছে এ ব্যাপারে একটি স্মারকলিপি দেন। কিন্তু প্রশাসন তাদের দাবি পূরণে ব্যর্থ হওয়ায় ১৮ জানুয়ারী থেকে তারা বাঘাইহাট বাজার বয়কট শুরু করেন। সাজেকবাসীর এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয় সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটি ও সাজেক নারী সমাজ নামে দু'টি সংগঠন। তাদের এই আন্দোলন দমনের জন্য সেনাবাহিনী সেটলারদের ব্যবহার করে। ২২ জানুয়ারী সেনাবাহিনী ও সেটলাররা যৌথভাবে রেতকাবাসহ বেশ কয়েকটি পাহাড়ি গ্রামে হানা দেয় এবং গণহারে পাহাড়িদের ওপর শারীরিক নির্যাতন ও বাড়িঘরে ব্যাপক লুটপাট চালায়। এর কয়েকদিন পর সেটলাররা বাঘাইহাট স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের মারধর ও জিম্মি করে রাখে। অপরদিকে, সেনাবাহিনীর সদস্যরা প্রতি রাতে পাহাড়িদের এলাকায় টহল দিয়ে এক ভীতিমূলক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে।

> **পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এখন ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে লড়াই সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। যতই দিন যাচ্ছে ততই তারা তাদের ওপর পরিচালিত জাতিগত নিপীড়নের কারণ ও চরিত্র উপলব্ধি করতে সম হচ্ছেন। সারা দেশের শোষিত নিপীড়িত ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণের মুক্তির সাথে যে তাদের মুক্তিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা এখন ধীরে ধীরে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।**

১৯ - ২০ ফেব্রুয়ারী যে হামলা হয় তার সাথে সেনাবাহিনী সরাসরি জড়িত। তারাই পাহাড়িদের ওপর প্রথমে ব্রাশ ফায়ার করে ও পরে বাড়িঘরে আগুন লাগিয়ে দেয়। এই হামলায় তিন ব্যক্তি নিহত ও একটি গীর্জা, দুইটি বৌদ্ধ মন্দির ও একটি ইউএনডিপি-পরিচালিত পাড়া কেন্দ্রসহ সাড়ে চার শত ঘরবাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। হামলার আসল উদ্দেশ্য হলো পাহাড়িদের ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে সেখানে নবাগত সেটলারদের পুনর্বাসন করা। এই ধরনের সহিংস হামলার মাধ্যমেই ইতিপূর্বে রামগড়, ফেনী, তাইন্দং, মাটিরাঙ্গা, লোগাং, লংগুদু, মাইসছড়ি ও দিঘীনালাসহ পার্বত্য চট্টগ্রামের বহু এলাকায় পাহাড়িদেরকে নিজ বসতভিটা থেকে উৎখাত করে সেটলারদের পুনর্বাসন করা হয়েছিল।

সাজেকে যে পাহাড়িদের ওপর হামলা করা হয়েছে তারা ইতিপূর্বে সেনাবাহিনী ও সেটলার কর্তৃক উৎখাত হয়ে সেখানে আবাস গড়ে তুলেছিলেন। স্বপন আদনান ২০০৪ সালে প্রকাশিত তার Migration, Land Alienation adn Ethnic Conflict: Causes of poverty in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh বই-এ লিখেছেন, "During the period of counter-insurgency, a group of Chakma households had moved into the Sajek Valley after being forced off their lands in Sarbotoly and Gulshakhali of Rangamati district by armed Bengali settlers. They settled in the area and undertook jum cultivation to meet their subsistence needs. By 1999, the population of the area had risen to approximately 15,000, about half of which consisted of the Chakma IDP." বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এখন তাদেরকে এই সাজেক এলাকা থেকেও উৎখাত করে সেখানে সেটলারদের বসিয়ে দিতে চাইছে।

রাষ্ট্রের এথনিক কিনজিং পলিসি

সাজেক ও খাগড়াছড়িতে হামলা কোন বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। দু'একজন খারাপ সেনা কমান্ডার বা প্রশাসনিক কর্মকর্তা বা কিছু সংখ্যক সেটলারের ওপর দায় চাপিয়েও এই হামলাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। পাহাড়ি জাতিসত্তার ওপর এই সব আগ্রাসন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের এথনিক ক্লিনজিং নীতিরই প্রতিফলন। বৃটিশ উপনিবেশের আগে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছিল কার্যতঃ রাজা-শাসিত স্বাধীন একটি অঞ্চল। বৃটিশরাই প্রথম পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপনিবেশিক শাসনাধীনে নিয়ে আসে। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের সময় বৃটিশ সরকার স্থানীয় জনগণের মতামত না নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের হাতে তুলে দেয়। এরপর ১৯৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ নামে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হলে পার্বত্য চট্টগ্রাম তার অংশে পরিণত হয়।

১৯৭২ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের তৎকালীন পাহাড়ি নেতারা শেখ মুজিবর রহমানের কাছে স্বায়ত্তশাসনের দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি দেন। কিন্তু নতুন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের বুর্জোয়া শাসকগোষ্ঠীর শিরোমণি শেখ মুজিব তা প্রত্যাখ্যান করেন ও পাহাড়িদেরকে বাঙালি হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তার আমলেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সম্পর্কে দেশের শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় নীতি নির্দিষ্ট হয়ে যায়। পরের সরকারগুলো ধারাবাহিকভাবে কেবল সেই নীতিই বাস্তবায়ন করেছে এবং করে চলেছে। এই রাষ্ট্রীয় নীতির অংশ হিসেবেই জিয়াউর রহমান ও স্বৈরাচারী এরশাদের শাসনামলে লক্ষ লক্ষ দরিদ্র শোষিত বাঙালিকে পার্বত্য চট্টগ্রামে ঢুকিয়ে তাদেরকে পাহাড়িদের বিরুদ্ধে জাতিগত নিপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠী দেশের শাসক-জাতির শোষিত সর্বহারা শ্রেণীর একটি অংশকে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জনগণের বিরুদ্ধে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে তার শ্রেণীস্বার্থ হাসিল করতে সচেষ্ট হয়।

পাহাড়ি জনগণ শাসকগোষ্ঠীর জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রথমে নিয়মতান্ত্রিক ও পরে সশস্ত্র পন্থায় প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। কিন্তু এই আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা, আদর্শিক ও তত্ত্বগত দৈন্যতা এবং সর্বোপরি দেশে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দীর্ঘ কাল ধরে স্থবিরতা বিরাজ করার কারণে জনসংহতি সমিতির নেতৃত্বে পরিচালিত এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ১৯৯৭ সালে তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকারের সাথে এক আপোষ চুক্তির মাধ্যমে পরিসমাপ্তি ঘটে। এই চুক্তি পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। কারণ এতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মৌলিক দাবিগুলোর কোনটিই শাসকগোষ্ঠী পূরণ করেনি। তদুপরি, চুক্তিতে ছোটখাট যেসব ছাড় দেয়া হয়েছে সেগুলোও বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ চুক্তির অন্তর্নিহিত দুর্বলতার মধ্যেই নিহিত। ফলে চুক্তির পরও পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে জাতিগত নিপীড়ন এক দণ্ডের জন্যও বন্ধ হয়নি। জনসংহতি সমিতির রাজনৈতিক যবনিকাপাতের পর নতুন করে আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট বা ইউপিডিএফ গঠিত হলে তার বিরুদ্ধে দমন পীড়ন শুরু হয়। সেনাবাহিনী কর্তৃক হত্যা, গ্রেফতার, নারী নির্যাতন, ভূমি বেদখল, জ্বালাও পোড়াও, গ্রামে গ্রামে হানা, তল্লাশী, হয়রানি, ধর্মীয় পরিহানি ইত্যাদি আগের মতোই অব্যাহত থাকে। তাছাড়া চুক্তির পর গত ১২ বছরে পাহাড়ি জনগণের বিরুদ্ধে ১১টির বেশী বড় মাপের সহিংস হামলা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ এখন ইউপিডিএফ-এর নেতৃত্বে সংগঠিত হয়ে লড়াই সংগ্রামে সামিল হচ্ছেন। যতই দিন যাচ্ছে ততই তারা তাদের ওপর পরিচালিত জাতিগত নিপীড়নের কারণ ও চরিত্র উপলব্ধি করতে সম হচ্ছেন। সারা দেশের শোষিত নিপীড়িত ব্যাপক শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতি জনগণের মুক্তির সাথে যে তাদের মুক্তিও অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত তা এখন ধীরে ধীরে সবার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় পর্যাস একাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যায়, মে ২০১০।

লক্ষীছড়ি উপজেলার বর্মাছড়ি ইউনিয়নে শিক্ষার হালচাল

সলিল চাকমা

অব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্কুল ভবনগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অনেক স্কুল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশের বদলে এখন গরু ছাগলের আবাস।

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলার প্রাইমারী শিক্ষা ব্যবস্থা বেহাল হয়ে পড়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে। স্কুলে নিয়মিত ক্লাশ হয় না, শিক্ষকরা মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর ক্লাশ নেন না। যদিও তারা সরকারী কোষাগার থেকে প্রতি মাসে বেতন ভাতা সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন। এমন শিক্ষকও হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে যিনি কোন দিন তার স্কুলের ধারে কাছেও যাননি, ছাত্রদের ক্লাশ নেয়া দূরের কথা। ফলে ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে, অব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে স্কুল ভবনগুলো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। অনেক স্কুল পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সেখানে ছাত্রছাত্রীদের ক্লাশের বদলে এখন গরু ছাগলের আবাস।

সরকারী কর্মকর্তা, ইউএনডিপি, ইউনিসেফ-এর অফিসের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় লক্ষীছড়িতে ইউএনডিপি'র অর্থায়নে জাবারাং কর্তৃক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা ৪২টি, ইউনিসেফ কর্তৃক পরিচালিত স্কুল ৭৩টি, সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৫টি, বেসরকারী রেজিঃ স্কুল ৩টি, সম্পূর্ণ বেসরকারী স্কুল ৭টি। তবে ব্র্যাক পরিচালিত স্কুলের সংখ্যা জানা যায়নি।

ফুত্তছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের বেহাল অবস্থা

পুরো লক্ষীছড়ি উপজেলায় হাই স্কুল মাত্র একটি -- লক্ষীছড়ি পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়। নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে ৪টি -- উল্লাতলী বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বর্মাছড়ি রেজিঃ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মধ্যম বর্মাছড়ি তনুরাম পাড়া বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কুদুকছড়ি বেসরকারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। কলেজ রয়েছে ১টি, যা সদরে অবস্থিত। নিচে কয়েকটি স্কুলের চিত্র সংক্ষেপে তুলে ধরা হল।

১। বটতলী বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় বিদ্যালয়:
এই স্কুলটি ইউএনডিপি'র অর্থায়নে জাবারাং কর্তৃক পরিচালিত। সরেজমিন দেখা গেছে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা নিয়মিত ক্লাশে আসে না। শিক্ষকরা ক্লাশ নিলেও ঠিকমত পাঠ দান করতে পারেন না। গত বছর পঞ্চম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষায় এই স্কুল থেকে একজনও পাশ করতে পারেনি। স্কুল ঘরটিও জীর্ণ শীর্ণ ও অপরিচ্ছন্ন। কোন কোন রুমে বেড়া পর্যন্ত নেই। গরু ছাগলের মল মূত্রের দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে। স্কুলটি ইউপিডিএফ-এর সহায়তায় স্থাপিত হয় ২০০১ সালে। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৬২ জন। এর মধ্যে শিশু শ্রেণীতে ১৪ জন, ১ম শ্রেণীতে ১৬ জন, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ৭ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ১০ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ১ জন ও ৫ম শ্রেণীতে ৫ জন।

২। বড়পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিষ্ণু ধর ও স্থানীয় হেডম্যান সুইচালা স্কুলের একাধিক সমস্যার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন স্কুলের আশেপাশের পরিবেশ নোংরা, স্কুলঘরে বেড়া নেই, ক্লাশ রুমের সংকট রয়েছে। এমনকি বিদ্যালয়ের মাটিও ধ্বসে পড়ছে। এই স্কুলের ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৯৭ জন। এর মধ্যে ৫ম শ্রেণীতে ৯ জন, ৪র্থ শ্রেণীতে ২৮ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ২০ জন, ২য় শ্রেণীতে ২৪ জন ও ১ম শ্রেণীতে ২৬ জন। বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয় ১৯৯২ সালে। পুরো স্কুলের জন্য বর্তমানে রয়েছেন মাত্র ১ জন শিক্ষক। তবে অভিভাবকরা আলো অং মারমা নামে আরো একজন শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছেন। তাকে সরকার কর্তৃক দেয়া স্কুল ফান্ড ও অভিভাবকদের উত্তোলিত ফান্ড থেকে ভাতা দেয়া হয়। তা সত্ত্বেও গত বছর তার এই স্কুল থেকে ৫ম শ্রেণীর পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ভালো হয়েছে বলে প্রধান শিক্ষক দাবি করেন। অভিভাবকরাও বলেন তার অক্লান্ত পরিশ্রমে ফলাফল ভালো হয়েছে। তিনি বিদ্যালয়ের শ্রেণী কক্ষে রান্না করে খান এবং রাত্রিযাপনও করেন সেখানে। তিনি বিদ্যালয়ের বহুমুখী সমস্যা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেয়া উচিত বলে মনে করেন।

৩। কুদুকছড়ি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৮৫ সালে। গত ২ জুন স্কুল সংক্রান্ত বিষয়ে স্কুলের অভিভাবক ও মুরুব্বীদের সাথে আলোচনার হয়। এ সময় ৫৮ জন উপস্থিত ছিলেন। হেডম্যান চাথোয়াই, প্রাক্তন ইউপি মেম্বার ভূজন চাকমা, স্কুলের অভিভাবক রসিক কুমার চাকমা ও স্কুলের সভাপতি সিচাই প্রু মারমা স্কুলের বিবিধ সমস্যার কথা তুলে ধরেন। স্কুলটি এক সময় বন্ধ থাকলেও ইউপিডিএফ-এর সহায়তায় আবার চালু করা হয়। এ ক্ষেত্রে শহীদ রুইখই মারমা (অংসাইন) বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। বর্তমানে শিক্ষক, অভিভাবক ও স্থানীয় পার্টি সদস্যরা ঠিকমত দায়িত্ব পালন না করার কারণে স্কুলটি ঠিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে না। শিক্ষকরা নিয়মিত বেতন ভাতা পান না। এ কারণে গত ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত স্কুলের ক্লাশ বন্ধ থাকে। স্কুলের প্রধান শিক্ষক হলেন জ্যোতিষ সেন চাকমা। এছাড়া দুই জন সহকারী শিক্ষক রয়েছেন। তারা হলেন আশাই মারমা ও সুইহ্লা মারমা। ছাত্রছাত্রীর মোট সংখ্যা ৫৯ জন। শিক্ষকরা পাঠদানে দুর্বল বলে স্থানীয় অভিভাবক রসিক কুমার দাবি করেছেন। তবে কথা বলে বোঝা গেছে অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে ছাত্ররাও নিয়মিত ক্লাশে আসে না। স্কুলের ভেতরের অবস্থাও অত্যন্ত করুণ। যদিও স্কুল ঘরটি পাকা, রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে এটি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিনের কিছু সময় ছাত্রছাত্রীরা ক্লাশ করলেও, অন্য সময় গরু ছাগলরা সেখানে আড্ডা জমায়। তাদের পায়খানা প্রস্রাবের দুর্গন্ধে সেখানে থাকা যায় না। ক্লাশ রুমের তালা ভাঙা।

৪। বিনাজুরী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
গত ৩ জুন বিনাজুরী পাড়ার সুইসাপ্রু মারমা, উচারুই মারমা ও সাজাইপ্রু মারমা বিদ্যালয়ের পড়ালেখা ও পরিবেশের করুণ অবস্থা তুলে ধরেন। এই স্কুলে শিক্ষক মাত্র ১ জন। তার নাম ওসমানি গণি। পরে অন্য একজনকে অভিভাবকরা শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেন। অপরদিকে, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১২৭ জন। এর মধ্যে ১ম শ্রেণীতে ৩৪ জন, ২য় শ্রেণীতে ২৫ জন, তৃতীয় শ্রেণীতে ২৫ জন, চতুর্থ শ্রেণীতে ২৫ জন ও ৫ম শ্রেণীতে ১৮ জন। মাত্র দুই জন শিক্ষকের পক্ষে এতজন ছাত্রকে পাঠদান করা মোটেই সম্ভব নয়। ফলে ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত শিক্ষা পাচ্ছে না।

৫। কুদুকছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়:
গত ৩ জুন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা, পাঠদান ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনার জন্য স্কুল পরিচালনা কমিটির সদস্য ও অভিভাবকদের সাথে আলোচনা হয়। এতে মোট ৪৫ জন উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি সাথোয়াই প্রু মারমা, স্থানীয় হেডম্যান সুইসালা মারমা ও অভিভাবক ললিত কুমার চাকমা বলেন, স্কুলের পড়াশুনার মান অত্যন্ত নিম্ন; ছাত্রছাত্রীদের স্কুলে উপস্থিতি কম। তারা বলেন এই স্কুলটি ইউপিডিএফ-এর উদ্যোগে ২০০৬ প্রতিষ্ঠা করা হয়। বর্তমানে স্কুলঘরটি জীর্ণ শীর্ণ; ছাদ ভেঙে পড়ছে। যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। স্কুল ঘরটির দেখাশোনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করার কেউ আছে বলে মনে হয় না। স্কুলের ভেতর গরু ছাগলের মলমূত্রের দুর্গন্ধে মনে হয় না এটা একটা স্কুল। ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে ১৫ জন, ৭ম শ্রেণীতে ১৮ জন ও ৮ম শ্রেণীতে ৫ জন। মোট ৩৮ জন। তাদের পড়ানোর জন্য শিক্ষক আছেন দুই জন: প্রধান শিক্ষক সুইচাই মারমা ও সহকারী শিক্ষক সাজাই মং মারমা।

৬। নাড়াইন্যাছড়ি বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় নাম দিলেও এই স্কুলটি চলছে কিন্ডারগার্টেন-এর মতো। ইউএনডিপি'র অর্থায়নে জাবারাং পরিচালনা করছে এ স্কুলটি। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২২ জন। কেজি-২ তে ১৬ জন ও কেজি-১ এ ৬ জন। শিক্ষক আছেন ২ জন। প্রধান শিক্ষক হিসেবে আছেন শান্তি চাকমা ও সহকারী শিক্ষক হিসেবে সখিনা চাকমা। স্কুলটি স্থাপিত হয় ২০০৮ সালে।

৭। মুক্তছড়ি বলিপাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
১৯৯৮ সালে স্থাপিত এই স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক হলেন নল মোহন চাকমা। আর সহকারী শিক্ষক গোলক চন্দ্র চাকমা। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৩৭ জন। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি রস কুমার চাকমা বলেন, ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের অনুপস্থিতি এবং অভিভাবকদের অসচেতনতার কারণে স্কুলে পড়াশুনা ঠিকভাবে চলছে না। গত ৮ জুন তিনি এ কথা বলেন।

৮। ফুত্তছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
১৯৬৫ সালে স্থাপিত এই স্কুলে বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪২ জন। তাদের বিপরীতে শিক্ষক আছেন মাত্র ১ জন। নাম স্বজন চাকমা। গত ৮ জুন মঙ্গল সেন চাকমা, মৃদু ময় চাকমা, রূপক চাকমা ও কিনা ধন চাকমা তার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেন, তিনি প্রতি মাসে মাত্র ৫/৬ দিন স্কুলে আসেন। থাকেন চট্টগ্রাম শহরে। বিদ্যালয়টির চেহারা ভাঙাচোরা ও জীর্ণশীর্ণ, যেন পরিত্যক্ত। বৃষ্টির সময় ছাদ দিয়ে পানি পড়ে। তখন ক্লাশ নেয়া যায় না। যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এলাকাবাসীর বার বার দাবি সত্ত্বেও সরকার নতুন স্কুল শিক্ষক নিয়োগ দিচ্ছে না, স্কুল ভবনটিরও সংস্কার করছে না। সারা বছর স্কুল বন্ধ থাকে বললেই চলে।

৯। কলাবনিয়া রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়:
১৯৮৯ সালে স্থাপিত এই স্কুলে বর্তমানে শিক্ষক রয়েছেন ৪ জন। প্রধান শিক্ষকের দায়িত্বে আছেন সঞ্জীব কুমার চাকমা। সহকারী শিক্ষকরা হলেন রবি কুমার চাকমা, দেবব্রত চাকমা ও সোমা চাকমা। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬৫ জন। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি শান্তি কুমার চাকমা বলেন, শিক্ষক চার জন হলেও স্কুলে নিয়মিত ক্লাশ হয় না। শিক্ষকদের পাঠদানের সমস্যা রয়েছে। বিদ্যালয়ের বেড়া, দরজা, জানালা প্রায় সবগুলো নেই। স্কুলঘরের ভেতরে গরুর মলমূত্রের দুর্গন্ধ, চারপাশ অপরিষ্কার ও ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ।

১০। উগুদোছড়ি (উল্টাছড়ি) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৯৫ সালে প্রধান শিক্ষক অমর বিজয় চাকমা। সহকারী শিক্ষক সুনীল চাকমা ও সঞ্জয় চাকমা। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬১ জন। সুনীল চাকমা বলেন, গত পাবলিক পরীক্ষায় ২৬ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ২৪ জন পাশ করেছে। বর্তমানে বর্ষার কারণে ছাত্রদের স্কুলে উপস্থিতির হার কম। তিনি স্কুলে পড়াশুনা ঠিকভাবে হচ্ছে বলে দাবি করেন।

১১। কেরেটকাবা (কেরেটকাটা) বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
৯ জুন স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি কমল সুখ চাকমা এই প্রতিবেদককে বলেন, ২০০৪ সালে স্থাপিত এই স্কুলে শিক্ষক আছেন মাত্র ১ জন। তার নাম প্রবারণ চাকমা। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪৩ জন।

১২। খিরাম মগকাটা কমিউনিটি বিদ্যালয়:
চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত ১৯৯৫ সালে বড়তলি পাড়ায় উপরোক্ত নামে বিদ্যালয়টি স্থাপিত হয়। শুরু থেকে কয়েক বছর ঠিকভাবে চললেও মাঝখানে বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বার বার দেয়া সত্ত্বেও কেউ দরখাস্ত জমা দেয়নি। কারণ শিক্ষাগত যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে বিএ দ্বিতীয় শ্রেণী। বেতন মাত্র তিন হাজার টাকা। এ বছর মে মাসে ২ জন শিক্ষক দুই হাজার টাকা মাসিক বেতনে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। নিয়োগ প্রাপ্তরা স্থানীয় বাসিন্দা। ইউপিডিএফ-এর প্রচেষ্টায় ফলে স্কুলের শিক্ষক নিয়োগ সম্ভব হয়েছে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৪২ জন। সবাই শিশু শ্রেণীতে। স্কুলে প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম এ বছর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছে।

১৩। তলুপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
এই স্কুলটি স্থাপিত হয় ১৯৬৫ সালে। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭৬ জন। শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন ৩ জন। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি বিধু ভূষণ চাকমা ও অভিভাবক তীর্থ কুমার চাকমা জানান, প্রধান শিক্ষক চিং সাথোয়াই ও সহকারী শিক্ষক আশীষ বড়ুয়া স্কুল পরিচালনা কমিটির অমতে আওয়ামী লীগের ক্ষমতার জোর দেখিয়ে পিটিআই ট্রেনিং নেয়ার নাম করে স্কুল থেকে স্বেচ্ছা ছুটি নিয়ে চলে যান। এরপর কলাবনিয়া থেকে দেবব্রত চাকমাকে ডেপুটেশনে এই স্কুলে আনা হলেও তিনি এ মাসেই (জুন) কলাবনিয়ায় তার নিজ স্কুলে চলে যান। ফলে স্কুলটিতে এখন রুনা তঞ্চঙ্গ্যা একা হয়ে পড়েন। অবশ্য কিছু দিন আগে তাকে সহযোগিতা করার জন্য অভিভাবকরা মিলে আর একজন শিক্ষিকা নিয়োগ দিয়েছেন। শোনা যাচ্ছে কথিত ট্রেনিং-এ যাওয়া শিক্ষকদ্বয় আর স্কুলে আসবেন না। কারণ তারা আওয়ামী লীগের সমর্থক। তারা ছাত্রদের ক্লাশ নিচ্ছেন না, অথচ মাসে মাসে সরকারের কোষাগার থেকে বেতন নিচ্ছেন। ফলে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অন্ধকারে থেকে যাচ্ছে পুরো এলাকা।

১৪। বর্মাছড়ি বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়:
বর্মাছড়ি বাজার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৯৬৮ সালে। বর্তমানে সরকারী শিক্ষক আছেন ২ জন। অভিভাবক কর্তৃক নিয়োগ দেয়া শিক্ষক ২ জন। মোট ৪ জন। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ২৪১ জন। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য।

১৫। বর্মাছড়ি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়:
এটি স্থাপিত হয় ১৯৮৩ সালে। শিক্ষক আছেন ৫ জন। প্রধান শিক্ষক হলেন প্রাণ কুমার চাকমা। ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৮২ জন। শিক্ষকদের পাঠদানে সমস্যা আছে বলে জানা গেছে। স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি কপিল সেন চাকমা ও অভিভাবক স্নেহ কুমার চাকমাসহ অনেকে বলেন, শিক্ষকদের পাঠদানের ক্ষেত্রে দুর্বলতা রয়েছে।

শিক্ষা অফিসারের বক্তব্য:
৯ জুন লক্ষীছড়ির প্রাইমারী শিক্ষার বেহাল অবস্থা সম্পর্কে মোবাইল ফোনে মতামত জানতে চাইলে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবুল হোসনে চৌধুরী বিষয়টি এড়িয়ে গিয়ে এ প্রতিবেদককে চায়ের আমন্ত্রণ জানান। পরে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (টিইও) মঞ্জুরুল হক চৌধুরীর সাথে ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি অকপটে শিক্ষা বিষয়ক সব ধরনের সমস্যার কথা স্বীকার করেন এবং একই সাথে ধৈর্য্য ধারণ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন অনতিবিলম্বে নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হবে। আর যে সব শিক্ষক নিয়মিত স্কুলে উপস্থিত থাকেন না তাদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দেয়ার পরামর্শ দেন। ৮ জুন ২০১০ ■

পাহাড়ি দুর্বৃত্তের সাথে সংঘবদ্ধ

৪র্থ পাতার পর

পাহাড়ি এজেন্টদের মত এরাও ক্ষমতাধর বিত্তশালী আওয়ামী লীগ-বিএনপি-জাতীয় পার্টির জুনিয়র পার্টনার। নিজেরা যে দলটির সাথে যুক্ত, সে দল ক্ষমতায় গেলে তবে তাদের জুটে ক্ষমতা-ব্যবসা-ঠিকাদারী-লাইসেন্স-পারমিট। কাজেই নিজেদের দলকে ক্ষমতায় বসাতে এরা সাধারণ জনগণের স্বার্থপরিপন্থী কাজে লিপ্ত হতেও পিছ পা হয় না। সংবিধানে জাতিসত্তার স্বীকৃতি না দিয়ে সবাইকে 'বাঙালি' বানানো, পার্বত্য চট্টগ্রামে সেটলার ঢুকিয়ে পাহাড়িদের নিজ বাসভূমে সংখ্যালঘু-পরবাসী বানানোর--আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র গণবিরোধী নীতি-পদক্ষেপের বিরুদ্ধে এদের কোন বক্তব্য নেই। অধিকন্তু নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থে পাহাড়িদের কাছে আওয়ামী লীগ-বিএনপি'কে গ্রহণযোগ্য করাতেই এরা নিয়োজিত থাকে। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ-বিএনপি'র শাখা বিস্তার করে, সাংগঠনিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটিয়ে পাহাড়ি জনগণের রাজনৈতিক শক্তি খর্ব করতে তারা মরিয়া। পাহাড়িদের মধ্যকার এ স্বার্থান্বেষী চক্রকে আওয়ামী লীগ-বিএনপি আশ্রয়-প্রশ্রয় ও মদদ দিয়ে সাধারণ জনগণের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।

নকল মধু তৈরির সাথে যুক্ত সামাজিক দুর্বৃত্তদের সহজে সনাক্ত করা গেলেও হিতাকাঙ্ক্ষীর লেবাসধারী গণবিরোধী এ চক্রকে চেনা তত সহজ নয়। এদের কার্যকলাপ অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং ক্ষতিও সুদূরপ্রসারি। পার্বত্য চট্টগ্রামের দারিদ্র্য বিমোচন, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি সংরক্ষণের নামে বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে টক শো, হরেক রকমের মেলা আয়োজন, ঢাকার বিলাসবহুল হোটেল রেস্তোরাঁয় গোল টেবিল বৈঠক, মত বিনিময় সভা, জমকালো অনুষ্ঠান-- নীলনক্সা অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে। তারই সমান্তালে প্রকাশিত হচ্ছে পত্র-পত্রিকায় রঙিন ক্রোড়পত্র, স্মরণিকা, সাক্ষাৎকার ও প্রতিবেদন। সুপরিকল্পিতভাবে চলছে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী অপপ্রচার।

একশ্রেণীর রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, লেখক, মানবাধিকার কর্মী, নারী নেত্রী, পরিবেশবাদীর... রাতারাতি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ে অতি আগ্রহী হয়ে পড়া, কখনও বা বিশেষজ্ঞ ও পাহাড়ি দরদী সাজার উদগ্র প্রয়াসের মধ্যে যে অসঙ্গতি ধরা পড়ে--তা সচেতন নাগরিকের দৃষ্টি এড়াতে পারে না। বাইরে লোকদেখানো গরম কথাবার্তা, পাহাড়িদের অধিকারের পক্ষে গলাবাজী করলেও এরা পাহাড়ি জনগণের অধিকার হরণকারী প্রধান দলগুলোর সাথে গাঁটছড়া বাঁধা। তাদের 'সহানুভূতিমূলক তৎপরতা' প্রকারান্তরে ক্ষমতাসীনদের লাভবান করে। এরা নীলনক্সা মত এসব কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়িদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এখন কেবল সরকারের দিক থেকে নয়, আদর্শিকভাবে পতিত পাহাড়ি-বাঙালি সংঘবদ্ধ অপরাধী চক্রের কাছ থেকেও বাধার সম্মুখীন হচ্ছে। এবং এ বাধা এখন বহুমুখী রূপ পরিগ্রহ করেছে।

এ কথা কারোর অজানা নয় যে, পাহাড়ের বনজ সম্পদ উজাড়ের পেছনেও রয়েছে পাহাড়ি বাঙালি দুর্নীতিবাজ চক্রের যোগসাজশ, সামরিক-বেসামরিক আমলা-ব্যবসায়ী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী এর সাথে জড়িত। চোরা পথে অবৈধভাবে কাঠ ও বনজ সম্পদ পাচারের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড় সমূহ ন্যাড়া হয়ে পড়েছে। প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি সাধিত হয়েছে ভয়ানকভাবে।

বনজ সম্পদ নিঃশেষ হবার পর তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ এখন খনিজ সম্পদের ওপর। পার্বত্য চট্টগ্রামে রয়েছে খনিজ সম্পদের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। খাগড়াছড়ি-ফটিকছড়ি সীমান্তে আবিস্কৃত সেমুতাঙ গ্যাস ফিল্ডে গ্যাস উত্তোলন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে, এ ব্যাপারে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের সুস্পষ্ট বক্তব্য ও দাবি আছে। নব্বইয়ের দশকে তৎকালীন শান্তি বাহিনী ও বাংলাদেশ সরকারের যুদ্ধ বিরতির সুযোগে বহুজাতিক কোম্পানী পার্বত্য চট্টগ্রামে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান জরিপ সম্পন্ন করে ফেলেছে। অনুসন্ধান কাজ নির্বিঘ্নে সম্পাদনের লক্ষ্যে বহুজাতিক কোম্পানী সে সময় পার্বত্য চট্টগ্রামে পাড়া-গ্রামের বিভিন্ন কাব ও সংস্থায় রঙিন টিভি-ফুটবল-ভলিবল প্রীতি উপহার হিসেবে দিয়েছিল। এমনকি যুব সমাজকে ব্যস্ত রাখতে ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষকতা দেবার আবরণে রাঙামাটিতে ফুটবল টুর্ণামেন্টেরও আয়োজন করেছিল। জানা যায় বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক বিশেষ বন্দোবস্তে তখনকার জনসংহতি সমিতির শীর্ষ নেতৃত্বকে দুই কোটি ডলার উপঢৌকন দেয়ার কথা। জনসংহতি সমিতির তখনকার কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা ধুধুকছড়ায় ছাত্র প্রতিনিধি দলের প্রশ্নের উত্তরে বহুজাতিক কোম্পানী কর্তৃক তেল-গ্যাসের ব্যাপারে ২% অর্থ দেবার কথা প্রকাশ করেছিলেন। পরে সন্তু লারমার গুপ্ত ঘাতকের হাতে চন্দ্রশেখর চাকমা গুলিবিদ্ধ হন (২০০৯ ফেব্রুয়ারি ২৫) এবং ক্ষত নিয়ে মারা যান (২০০৯ আগস্ট ৯)। তেল-গ্যাস বিষয়ে বহুজাতিক কোম্পানির সাথে জনসংহতি সমিতির কী বোঝাপড়া হয়েছিল তা আর জানা যায়নি, কারণ জনসংহতি সমিতি এখন বহুধা বিভক্ত। কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক চন্দ্রশেখর চাকমা মারা যাওয়াতে বিষয়টি রহস্যাবৃত রয়ে গেছে।

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান জরিপ পরবর্তী সম্পদ উত্তোলন ও আহরণ নির্বিঘ্ন করতেও বহুজাতিক কোম্পানী ও শাসকগোষ্ঠীর প্রয়োজন হয়ে পড়ে স্থানীয় সহযোগী। সে লক্ষ্যেই তড়িঘড়ি করে 'পার্বত্য চুক্তি' সম্পাদন ও 'আঞ্চলিক পরিষদ' গঠিত হয়। এতে পাহাড়িদের একটি অংশকে বাগিয়ে নেয়া, সন্তু লারমার নেতৃত্বে এদের সরকার-প্রশাসন যন্ত্রের অংশীদার এবং প্রধান সহযোগী বানিয়ে বশীভূত করা সম্ভব হলেও, তাতে কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে গণঅসন্তোষ দূর হয়নি। অন্যদিকে সন্তু লারমা মূলধারা থেকে বিচ্যুত ও জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন। জনসংহতি সমিতিও ভেঙে দুর্বল হয়েছে। শাসকগোষ্ঠী বহুজাতিক কোম্পানী নিজেদের স্বার্থে তাকে টিকিয়ে রেখেছে এবং নানাভাবে মদদ দিচ্ছে।

জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা নয়, নিজের গদি ঠিক রাখতে এখন সন্তু লারমা সরকার শাসকগোষ্ঠীকে আঁকড়ে ধরেছেন। ঠিক একই কাজ করে চলেছে পাহাড়ি আওয়ামী লীগার-বিএনপিওয়ালারা। সবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিজেদের গদি-স্বার্থ ঠিক রাখা। পার্বত্য চট্টগ্রামে আওয়ামী লীগ বিএনপি'র শ্রীবৃদ্ধি ঘটছে পাহাড়ি আওয়ামী লীগার ও পাহাড়ি বিএনপিওয়ালাদের কল্যাণে। আর শাসকগোষ্ঠীর ক্ষমতা পোক্ত এবং দমন-পীড়ন জারি রাখা সম্ভব হচ্ছে সন্তু লারমার দালালি ভূমিকার কারণে। রাজনীতির ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর পার্বত্য চট্টগ্রামের জুনিয়র পার্টনার হচ্ছেন সন্তু লারমা। ব্যবসা-রাজনীতি সর্বক্ষেত্রে এ চক্রের মিলিত ষড়যন্ত্র-আঁতাতের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ পাহাড়ি বাঙালি জনগণ অবর্ণনীয় শোষণ-নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছেন।

পূর্বেউল্লেখিত চার শ্রেণীর মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেদের চেনা সহজ এবং তাদের অপকর্ম প্রতিরোধ করা কঠিন কিছু নয়। তৃতীয় শ্রেণীর লোকেরা ধূর্ত হলেও তারা জনগণের অজ্ঞাত কেউ নয়। কিন্তু চতুর্থ শ্রেণীর লোকেরা যারা শুভাকাঙ্ক্ষী উন্নয়নের ছদ্মাবরণে কাজ করে তাদের চেনা সবচে' কঠিন এবং তারাই আড়ালে বেশি অনিষ্ট করে থাকে। সে কারণে এদের চিনে রাখা এবং তাদের ক্ষতিকর তৎপরতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো প্রতিটি সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব।

পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে আদর্শিকভাবে বিচ্যুত সংঘবদ্ধ পাহাড়ি-বাঙালি গণবিরোধী চক্র (বহুজাতিক কোম্পানীর দালাল) নানাভাবে বিভ্রান্তি ও ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে। এদের অপতৎপরতার বিরুদ্ধে পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের প্রতিটি নাগরিককে সজাগ হতে হবে। গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি ছাত্র-যুবকের কর্তব্য হচ্ছে চিহ্নিত পাহাড়ি-বাঙালির এ সংঘবদ্ধ গণবিরোধী চক্রের বির"দ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া এবং এদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই জোরদার করা। [সৌজন্যে ল্যাম্পপোস্ট, ৫, ২২ এপ্রিল ২০১০]

প্রধানমন্ত্রীর কাছে পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের স্মারকলিপি

৩য় পাতার পর

উপস্থিতিতে এই সহিংসতা ঘটেছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে সে বিষয়েও তদন্ত করতে হবে। সেই সঙ্গে, এর জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে।

২. ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও যথাযথ পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তাদের জন্য যথাযথ ক্ষতিপূরণ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. নাগরিক গোষ্ঠী, সাংবাদিক এবং সহিংস হামলার শিকার ও প্রত্যক্ষদর্শীসহ সবার মত প্রকাশের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি পাহাড়িদের কণ্ঠরোধ এবং অহিংস প্রতিবাদের পথ রুদ্ধ করার যেকোনো দমননীতি বা ভয়ভীতি প্রদর্শন বন্ধ করার জন্য আইনসম্মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. বাঘাইঘাট বাজারে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে পাহাড়িরা যে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তা দূর করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে করে পাহাড়িরা বাধ্য না হয়ে স্বেচ্ছায় বাজারে যেতে উৎসাহিত বোধ করে।

৫. সেনাবাহিনী ও বেসামরিক কর্তৃপক্ষের প্রচ্ছন্ন সহায়তায় বাঘাইহাট-সাজেক সড়কের পাশে পাহাড়িদের উৎখাত করে বাঙালি অভিবাসীদের বসতিস্থাপন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে।

৬. পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বিধান এবং আঞ্চলিক পরিষদের সুপারিশ অনুযায়ী পাবর্ত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ অবিলম্বে সংশোধন করতে হবে; এবং ভূমি কমিশনের পরবর্তী সব সিদ্ধান্ত কমিশনের সদস্য পাহাড়ি নেতাদের সম্মতির ভিত্তিতে নিতে হবে।

৭. পাবর্ত্য চট্টগ্রাম চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য অঞ্চলের অস্থায়ী সেনা ক্যাম্পগুলো পর্যায়ক্রমে তুলে নিতে হবে যাতে সেখানে অপ্রয়োজনীয় সামরিক নিয়ন্ত্রণ এবং তজ্জনিত উত্তেজনার মাত্রা কমে আসে এবং এই অঞ্চলে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে।

লর্ড এরিক এভবারি	**সুলতানা কামাল**	**ইডা নিকোলসেন**
কো-চেয়ার	কো-চেয়ার	কো-চেয়ার
পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন	পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশন

যে সব ব্যক্তি ও সংস্থার সাথে কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার তালিকা

খাগড়াছড়ির নাগরিক সমাজ, কুজেন্দ্রলাল ত্রিপুরা, পার্বত্য জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, খাগড়াছড়ি; আনিসুল হক ভূঁইয়া, জেলা প্রশাসক, খাগড়াছড়ি; ব্রিগেডিয়ার জেনারেল হামিদুর রহমান, ব্রিগেড কমান্ডার, খাগড়াছড়ি; সম-অধিকার আন্দোলন, খাগড়াছড়ি; সম-অধিকার আন্দোলন, রাঙামাটি; ভূমি রক্ষা কমিটি, সাজেক; সাজেক নারী সমাজ; বশিরুল হক ভূঁইয়া, বাঘাইহাট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা; লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোহসিন আলম, বাঘাইহাট জোন কমান্ডার; জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ; জনসংহতি সমিতি (জেএসএস); পার্বত্য চট্টগ্রাম নাগরিক কমিটি; ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ); সৌরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, জেলা প্রশাসক, রাঙামাটি; খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি কমিশন; মোঃ মইনুদ্দিন খান, রাঙামাটি বিভাগীয় বন কর্মকর্তা (উত্তর); মোঃ শাহ আলম, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি; স্টিফান ফ্রোরেইন, রাষ্ট্রদূত এবং বাংলাদেশে ইউরোপীয় কমিশন প্রতিনিধি দলের প্রধান; স্টিফেন ইভান্স, ব্রিটিশ হাই কমিশনার; নিকোলাস জে ডিন, ডেপুটি চীফ অব মিশন, আমেরিকা; কিলমেনি বেকারিং ডিলকার্স, অস্ট্রেলিয়ার ডেপুটি হাই কমিশনার; রবার্ট ম্যাকডুগাল, কানাডার হাই কমিশনার; তামোৎসু শিনোৎসুকা, জাপানি রাষ্ট্রদূত; অইনার জেনসন, রাষ্ট্রদূত ডেনমার্ক; চার্লি কসারেট, রাষ্ট্রদূত ফ্রান্স; ইতালা মারিয়া মার্থা ওক্তি, রাষ্ট্রদূত ইতালি; ডুসুন পার্ক, ডেপুটি হেড অব মিশন, কোরিয়া; ইঙ্গেবির্য়ন স্টোফরিজ, নরওয়ে রাষ্ট্রদূত; আর্তুরো মেনুয়েল পেরেজ মার্টিনেজ, স্পেনের রাষ্ট্রদূত; প্যাট্রিক সুইফিং, প্রজেক্ট ডিরেক্টর, সিএইচটিডিএফ, ইউএনডিপি; ডায়না ডেলটন, ভারপ্রাপ্ত কান্ট্রি ডিরেক্টর, ডিএফআইডি-বি; ডেনিশ শর্মা, ভারপ্রাপ্ত মিশন ডিরেক্টর,ইউএসএআইডি; স্যামুয়েল এগোরো, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, সুইডেন।

অনুলিপি:

১. সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী, মাননীয় সংসদ উপনেতা ও চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি। ২. ডা. দীপু মনি, মাননীয় মন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৩. ব্যারিস্টার শফিক আহমেদ, মাননীয় মন্ত্রী, আইন, বিচার ও সংসদীয় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৪. জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম, মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৫. জনাব মো: রেজাউল করিম হীরা, মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৬. জনাব দীপংকর তালুকদার, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৭. জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ, রাঙামাটি ৮. জনাব হাসান মাহমুদ, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ৯. জনাব প্রমোদ মানকিন, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ১০. জনাব মো: শাহ আলম এমপি, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। ১১. জনাব যতীন্দ্রলাল ত্রিপুরা, মাননীয় চেয়ারম্যান, ভারত প্রত্যাগত শরণার্থী ও অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু পুর্নবাসন টাস্কফোর্স। ১২. জনাব বীর বাহাদুর এমপি, মাননীয় চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, রাঙামাটি। ১৩. বিচারপতি খাদেমুল ইসলাম চৌধুরী, চেয়ারম্যান, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন।

টীকা:

১ পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে: 'বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে মানবাধিকার, গণতন্ত্র এবং ১৯৯৭ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির বাস্তবায়ন যাচাই করাসহ নাগরিক ও আইনগত অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রতি শ্রদ্ধা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা। এই কমিশন পূর্ববর্তী পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের (১৯৯০-২০০১) কাজের উপর নির্ভর করে এগুবে।'

২ বাংলাদেশের ভেতরের ও বাইরের সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়েছে। সদস্যারা হলেন (নামের ইংরেজি বর্ণানুক্রমে): ড. স্বপন আদনান; লর্ড এরিক আভেবুরি (সিএইচটি কমিশন কো-চেয়ার), ভাইস-চেয়ার পার্লামেন্টারি হিউম্যান রাইটস গ্রুপ, যুক্তরাজ্য; লারস অ্যান্ডার বায়ের, প্রেসিডেন্ট অব দ্য সামি পার্লামেন্ট, সুইডেন; ভিক্টোরিয়া টাউলি করপাজ, চেয়ার, ইউএন পারমানেন্ট ফোরাম অন ইন্ডিজেনাস ইস্যুজ; রবার্ট ইভানস, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের সদস্য; সারা হোসেন, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী; অধ্যাপক মহম্মদ জাফর ইকবাল, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট; সুলতানা কামাল (পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ার); ড. ইডা নিকোলাইসেন (পার্বত্য চট্টগ্রাম কমিশনের কো-চেয়ার), সিনিয়র রিসার্চার, নরডিক ইনস্টিটিউট অব এশিয়ান স্টাডিজ, ডেনমার্ক; লি সুইপস্টন, আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) মানবাধিকার বিষয়ক সাবেক জেষ্ঠ্য উপদেষ্টা; হিদেয়াকি ওইমুরা, জাপানের শিমিন গাইকো সেন্টারের প্রেসিডেন্ট।

৩ ২০১০ সালের ১৮-২৪ জুন কমিশনের এই মিশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন: ড. স্বপন আদনান, কমিশন সদস্য; ড. মেঘনা গুহঠাকুরতা এবং টম এসকিল্ডসেন, কমিশনের উপদেষ্টা; এবং ক্রিস্টিনা নিলসন এবং হানা শামস আহমেদ, কমিশন সেক্রেটারিয়েটের সমন্বয়কারী।

১ম বর্ষ ॥ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ॥ ৫ জুলাই ২০১০ ॥ জাতীয় বার্তা

মাটিরাঙ্গায় আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্য ও গ্রামবাসীর মুক্তি দাবি

গত ৩ জুলাই ২০১০ শনিবার খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা থেকে এক ইউপিডিএফ সদস্য ও অন্য এক গ্রামবাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ইউপিডিএফ সদস্যের নাম আলোক ময় চাকমা, ৪৫, পিতা শেরখা চাকমা, গ্রাম পুজগাঙ। আটককৃত গ্রামবাসীর নাম আপ্রু মং মার্মা, ২৫, পিতার নাম আতং মার্মা গ্রাম ১ নং রাবার বাগান, মাটিরাঙ্গা।

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের অন্যতম সংগঠক কালো প্রিয় চাকমা এক বিবৃতিতে উক্ত দু' ব্যক্তির গ্রেফতারের নিন্দা করে অবিলম্বে তাদের মুক্তি দেয়ার দাবি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আলোক ময় চাকমা সাংগঠনিক কাজে মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১০ নং এলাকায় গেলে সকাল ১০:৩০টার দিকে মাটিরাঙ্গা জোনের একদল সেনা সদস্য তাকে আটক করে। এরপর তাকে নিয়ে সেনা সদস্যরা দুপুর আড়াইটার দিকে ১ নং রাবার বাগানের তৈমাথাই এলাকায় গিয়ে আপ্রু মং মার্মার বাড়ি ঘেরাও করে এবং তাকে ধরে নিয়ে যায়। কি কারণে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা সেনারা জানায়নি।

কালোপ্রিয় চাকমা ইউপিডিএফ নেতা কর্মি ও সাধারণ গ্রামবাসীদের ধরপাকড় ও নির্যাতন বন্ধের দাবি জানিয়ে বলেন, সংবিধান মোতাবেক দেশের যে কোন নাগরিকের শান্তিপূর্ণভাবে সভা সমাবেশ ও সাংগঠনিক কার্যক্রম চালানোর অধিকার রয়েছে; কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে সে অধিকার বার বার পদদলিত করা হচ্ছে।

ইউপিডিএফ-এর প্রকাশনা বিভাগের নিরন চাকমা স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা বলা হয়েছে।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফ-এর মাদকবিরোধী অভিযান : ৪০ বোতল ফেনসিডিল আটক

কাপি চাকমা: গত ১০ জুন ২০১০ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ইউপিডিএফ-এর পেরাছড়া ইউনিটের সদস্যরা গাছবান নামক স্থানে এক মাদকবিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় ধুদুকছড়া থেকে খাগড়াছড়িতে মোটসাইকেল যোগে ফেনসিডিল পাচারকারী মিতুক চাকমা ও মোক্তার নামে দুই ব্যবসায়ীকে ৪০ বোতল ফেনসিডিলসহ আটক করা হয়। আটকের পর দুই ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মুচলেকা গ্রহণপূর্বক মুরুব্বীদের জিম্মায় ছেড়ে দেয়া হয় এবং আটকৃত ৪০ বোতল ফেনসিডিল জনসম্মুখে নষ্ট করা হয়।

অন্যদিকে গত ১২ জুন একই এলাকা থেকে অভিযান চালিয়ে তুলামনি চাকমা নামক এক মাদক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। পরে উদ্ধারকৃত গাজা পুড়িয়ে ফেলা হয়।

গোপন তথ্যে প্রকাশ, প্রায় সময়ই ভারত থেকে ফেনসিডিল-হেরোইনসহ নানা ধরনের মাদকদ্রব্য পাচার করা হয়ে থাকে। এসব মাদক প্রথমে খাগড়াছড়ি জেলার পানছড়ি উপজেলার সীমান্তবর্তী ধুধুকছড়ায় আনা হয়। পরে নিরাপত্তাবাহিনী ও প্রশাসনকে ফাঁকি দিয়ে কিংবা তাদের "ম্যানেজ করে" মাদক ব্যবসায়ীরা ধুধুকছড়া থেকে এসব মাদকদ্রব্য খাগড়াছড়িসহ বিভিন্ন জায়গায় পাচার করে থাকে।

একটি বিশেষ মহল প্রতিবাদী যুব সমাজকে ধ্বংস করার জন্য পরিকল্পিতভাবে তাদের কাছে মাদক দ্রব্য পৌঁছে দিচ্ছে। এসব মাদক গ্রহণ করে যুব সমাজ অধঃপতনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ভারত থেকে প্রতিনিয়ত মাদকদ্রব্য পাচার হলেও প্রশাসনের তেমন কোন নজরদারি নেই।

মাদক সেবনের ফলে একদিকে যেমন যুব সমাজের অবক্ষয় হচ্ছে অন্যদিকে সমাজে দেখা দিচ্ছে নানা বিশৃঙ্খলা। তাই মাদকের বিরুদ্ধে সকলের সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে অভিভাবকদের অভিমত। মাদক পাচার রোধে প্রশাসনের পক্ষ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত।

বর্মাছড়িতে ফুটবল টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত

সমাজ কল্যাণ ক্লাব ও বর্মাছড়ি হাই স্কুল এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ফুটবল টুর্নামেন্ট গত ৯ জুন বর্মাছড়ি হাই স্কুল মাঠে ফাইনাল খেলার মাধ্যমে সমাপ্ত হয়েছে। গত ১২ মে থেকে শুরু হওয়া উক্ত টুর্নামেন্টে মোট ১৬টি দল অংশগ্রহণ করে।

১২ই মে টুর্নামেন্টের উদ্বোধন ঘোষণা করেন পরিচালনা কমিটি ও বর্মাছড়ি জুনিয়র হাই স্কুল পরিচালনা কমিটির সভাপতি কপিল সেন চাকমা। প্রধান অতিথি হিসেবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন কাউখালি উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান অর্জুন মনি চাকমা। উদ্বোধনী ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় স্বাগতিক বর্মাছড়ি মুখ পাড়া ও কলাবুনিয়ার মধ্যে।

টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয় ক্ষিত্তিপাড়া দল ও রানার্স আপ হয় সুমন্ত পাড়া ফুটবল দল। সমাপনী অনুষ্ঠানে পুরষ্কার বিতরণ করেন ইউপিডিএফ নেতা সচিব চাকমা। এতে উপস্থিত ছিলেন বর্মাছড়ি জুনিয়র হাই স্কুলের শিক্ষক আশুতোষ তালুকদার, ডা. প্রতুল কান্তি চাকমা প্রমুখ।

প্রায় এক মাস ধরে চলা টুর্নামেন্টটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া জাগায়। হাজার হাজার দর্শক এই খেলা উপভোগ করেন।

২৯ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম বাঘাইছড়ি কমিটি গঠিত

আন্দোলন ধ্বংসের ষড়যন্ত্র বরদাস্ত করা হবে না বলে হুশিয়ারী

জাতীয় বার্তা রিপোর্ট: গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গত ২৯ জুন সকালে রাঙামাটি জেলার বাঘাইছড়ি উপজেলার রূপকারী এলাকার গোলাছড়িতে এক আলোচনা সভা ও যুব সমাবেশের মাধ্যমে ২৯ সদস্য বিশিষ্ট বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখা কমিটি গঠন করেছে। উপস্থিত সকলের সম্মতির ভিত্তিতে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও সাংগঠনিক সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে চিক্কোধন চাকমা, শক্তিলাল চাকমা ও অঙ্গদ চাকমা।

কমিটি গঠনপূর্ব আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব ফোরাম কেন্দ্রীয় সদস্য রেমিন চাকমা। বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ বাঘাইছড়ি উপজেলা সংগঠক সজর্ষি চাকমা, এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তি পূর্ণলাল চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশন বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক শর্মিলা চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম পানছড়ি উপজেলা শাখার আহ্বায়ক নিকোলাস চাকমা।

সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, জুম্ম জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ধ্বংসের জন্য সরকার নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। আঞ্চলিক পরিষদ ও জেলা পরিষদে গণতন্ত্রের নিকুচি করে অনির্বাচিতভাবে বা ফ্যাক্সের মাধ্যমে নিজেদের তল্পিবাহক দালালদের ক্ষমতায় বসিয়ে এবং তাদের প্রজেক্ট-অনুদান-গম-চালের বরাদ্দ দিয়ে সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামে সুবিধাবাদী এক গোষ্ঠি সৃষ্টি করেছে যাদের কাজ হচ্ছে সমাজে যাতে আন্দোলন গড়ে না উঠে তার জন্য সরকারের বি টিম হিসেবে কাজ করে যাওয়া। এরই অংশ হিসেবে সন্তু লারমা গণতান্ত্রিক সংগঠন ইউপিডিএফ-কে নিষিদ্ধ দাবি সরকারের কাছে করে যাচ্ছেন। সন্তু লারমা আজ জনবিচ্ছিন্ন হয়ে শেষ জীবনে সরকারের লাঠিয়ালে পরিণত হয়েছেন এবং ইউপিডিএফ নেতা কর্মীদের উপর হামলা ও হত্যাকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত সন্তু লারমা সন্ত্রাসীদের হাতে ইউপিডিএফ এর দুই শতাধিক নেতা-কর্মী খুন হয়েছে। এই হত্যার কোনো প্রতিকার এবং বিচার সরকার করতে পারেনি। পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি জবরদখলকে বৈধতা দিতে বর্তমানে ভূমি কমিশন কাজ করে যাচ্ছে বলে বক্তারা সমাবেশে অভিযোগ করেন।

বক্তারা বলেন, গঙ্গারাম-সাজেকে এখনো ভূমি দখলের জন্য সেনা-সেটলাররা নানা ধরনের ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। সরকার ১৯-২০ ফেব্রুয়ারি সাজেক হামলার হোতাদের গ্রেপ্তার করেনি বরং জনগণের শান্তিপূর্ণ বাজার বয়কটের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে বাঘাইহাট সড়কে বাজার কমিটি নামধারী চাঁদাবাজদের দ্বারা জুম্মদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টোল আদায় করে জুম্মদের উপর হয়রানী করছে। সাজেকে জুম্ম জনগণের উপর হয়রানী বন্ধ না হলে জনগণ চাঁদাবাজদের প্রতিরোধ করবে বলে বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করেন।

নেতৃবৃন্দ বলেন, আন্দোলন ধ্বংসের যে কোনো ষড়যন্ত্র যুব সমাজ বরদাস্ত করবে না। পূর্ণস্বায়ত্তশাসন কায়েম না হওয়া পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজ আন্দোলন চালিয়ে যাবে। ভয় ভীতি দেখিয়ে কোন লাভ হবে না। সমাবেশ পরিবচালনা করেন যুব ফোরাম দিঘীনালা উপজেলা সদস্য কিশোর চাকমা।

নতুন আরেকটি ক্যাম্প!

সুবীর, আজশি: ২ জুলাই: পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্যাম্প স্থাপন মানেই হচ্ছে নির্যাতনের স্টীমরোলারে পিষ্ট হওয়া, বহিরাগত বসতি সম্প্রসারণ ও নিজ ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হবার আতঙ্কে থাকা। এ যাবৎ যেখানেই সেনা চৌকি স্থাপন করা হয়েছে সেখানেই চলেছে নির্যাতন, চলেছে জনগণের জায়গাজমি কেড়ে নেবার চক্রান্ত। বিজিতলা সেনা ক্যাম্প স্থাপন হওয়ার পর ২০০৬ সালে কেড়ে নেয়া হয়েছে জনগণের শতাধিক একর পাহাড় ভূমি ও আবাদি জমি। তারপর সে জমিতে সেনা সহায়তা দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে শতাধিক সেটলার পরিবার।

বিজিতলা এলাকার এক-দেড় কিলোমিটারের মধ্যে গামারিঢালা-মাচ্যাছড়া এলাকায় সম্প্রতি নতুন একটি এপিবিএন ক্যাম্প স্থাপনের চেষ্টা চালানো হচ্ছে। গত ১৪ জুন এ উদ্দেশ্যে এপিবিএন এর সৈন্যরা গামারিঢালার কাছে খাগড়াছড়ি-মাচ্যাছড়া সড়কের বামপাশের একটি টিলায় ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে, সেগুন-গামারিসহ বেশ কিছু বড় গাছ কাটে। তারপর তারা তাদের গাড়িতে করে কর্তিত গাছগুলো তাদের ক্যাম্পে নেয়ে যায়। এরপর তারা ১৯ জুন সেখানে দু'টি ছোটো চৌকি তৈরি করে। এ সময়ের মধ্যে উক্ত জায়গায় যে ক্যাম্প স্থাপন করা হচ্ছে তা জায়গার মালিক জানতেন না। কারণ বর্তমানে তিনি ঢাকায় বসবাস করছেন। জায়গার মালিক মিহির কিরণ চাকমা যখন জানতে পারেন যে তার জায়গায় একটি ক্যাম্প বসানো হচ্ছে তখনই তিনি তৎপর হয়ে ওঠেন। তিনি ঢাকায় অবস্থানরত এক পাহাড়ি আর্মি অফিসারের শরণাপন্ন হন এবং তার সহায়তা কামনা করেন। এতে আপাতত ক্যাম্প স্থাপন বন্ধ রাখা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে এখনো তাদের চৌকিগুলো সরিয়ে নেয়া হয়নি। পার্শ্ববর্তী লোকজন বলছেন এভাবে কতদিন উক্ত ক্যাম্প স্থাপন ঠেকিয়ে রাখা যাবে তা সন্দেহের বিষয়।

রাঙামাটিতে ইউপিডিএফ সদস্য আটক: অস্ত্র পাওয়ার তথ্য ভিত্তিহীন

ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিটের প্রধান সংগঠক শান্তি দেব চাকমা ২৫ জুন শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেছেন কতিপয় সংবাদ মাধ্যমে সেনাবাহিনী কর্তৃক আটককৃত ইউপিডিএফ সদস্য শিশু মনি চাকমার কাছ থেকে অস্ত্র ও গুলি পাওয়া গেছে বলে যে তথ্য পরিবেশিত হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

তিনি বলেন, শিশু মনি চাকমাকে ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টায় "নানিয়াচরে চাঁদাবাজি করার সময়" আটক করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হলেও, প্রকৃতপক্ষে তাকে সাদা পোষাকধারী সেনা সদস্যরা আটক করে ২২ জুন বিকেল ৩:৩০টায় রাঙামাটি শহরের অনতিদূরে দিঘেলিবাগ নামক এলাকা থেকে। এ সময় ৫-৬ জন সেনা সদস্য একটি যাত্রীবাহী নৌকায় করে সাদা পোষাকে রাঙামাটি যাচ্ছিলেন। শিশু মনি চাকমা ও তার দুই সঙ্গী রাঙামাটি যাওয়ার জন্য ঐ নৌকায় উঠতে চাইলে সেনারা তাদের বাধা দেয়। এক পর্যায়ে কথা কাটাকাটি থেকে তাদের মধ্যে মারামারি শুরু হয়। এ সময় সাদা পোষাকধারী এক সেনা সদস্যও গুরুতর আহত হয়। তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শান্তি দেব চাকমা অভিযোগ করে বলেন, সেনারা শিশু মনি চাকমাকে আটক করে সেনা ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে অমানুষিকভাবে মারধর করে। এতে সে মারাত্মকভাবে আহত হলে তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর তাকে সেনা পোষাক পরিয়ে দিয়ে ও হাতে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে ছবি তোলা হয়, যা বিভিন্ন পত্রিকার সাংবাদিকদের কাছে সরবরাহ করা হয়। এছাড়া তার বিরুদ্ধে থানায় মিথ্যাভাবে চাঁদাবাজি ও অস্ত্র মামলা দেয়া হয়।

ইউপিডিএফ নেতা অবিলম্বে ইউপিডিএফ সদস্য শিশুমনি চাকমাকে নিঃশর্ত মুক্তি ও তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি জানান।

বিজিতলা ক্যাম্প কমান্ডারের নির্দেশ: সবাইকে একটি করে খুঁটি ক্যাম্পে দিয়ে আসতে হবে

সুবীর, আজশি: ২ জুলাই: বিজিতলা ক্যাম্পের কমান্ডার সুবেদার কাদের (অন্য একজনের মতে সেলিম) পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকজনকে নির্দেশ দিয়েছেন, প্রতি পরিবারকে একটি করে গাছের খুঁটি ক্যাম্পে দিয়ে আসতে হবে।

গত ২৬ জুন তিনি এই নির্দেশ দেন বলে জানা গেছে। এ আদেশ না মানলে "শাস্তি" দেয়া হবে বলে হুমকি দেয়া হয়েছে। জানা গেছে নির্যাতনের ভয়ে দুই নং প্রকল্পের গ্রামবাসীরা সম্প্রতি একটি করে খুঁটি ক্যাম্পে দিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছেন। বিজিতলা দোকানের ব্যবসায়ীদেরও একই আদেশ দেয়া হয়েছে। ভয়ে এখন সবাই ত্রটস্থ!

লোকজন জানান, গত ক'দিন আগে বিজিতলা ক্যাম্পের পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে ও পাহাড়ে বহিরাগত সেটলারদের বসানোর উদ্যোগ নেয় সেনাবাহিনীর বিজিতলা জোন। এসময় এলাকার জনগণ একত্রিত হয়ে সরাসরি ক্যাম্প কমান্ডার ও বহিরাগত সেটলারদের জানিয়ে দেয়, জায়গা দখলের চক্রান্ত বা উদ্যোগ নেয়া হলে জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এর জবাব দেবে। এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদের কারণে সেনা-সেটলাররা পিছু হটে যায়। এলাকাবাসীর ধারণা, এর প্রতিশোধ হিসেবে এভাবে তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে। আগামিতে এ ধরনের হয়রানী আরো বাড়তে পারে বলে তাদের আশঙ্কা।